শাহাদুজ্জামান

আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের এক যুবকের কথা ভাবি যে দূরের ছোট্ট দ্বীপ দেশ কিউবার দিকে কৌতূহলে তাকায়। মাত্র বছর বত্রিশের এক তরুণ ক্যাস্ত্রো তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে পরাক্রমশালী আমেরিকার একেবারে নাকের ডগায় ঘটিয়ে ফেলেছিলেন এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তারপর আমেরিকার অবিরাম বিরোধিতা আর চোখ রাঙানির ভেতরও টিকিয়ে রেখেছেন সেই বিপ্লবের মন্ত্রকে। একসময় নদীর পাড় ভাঙার মতো পৃথিবীর চারদিকে এক এক করে শোনা গেল সমাজতান্ত্রিক চরাচরের ভাঙনের শব্দ; কিন্তু তবু ক্যাস্ট্রো তার নিঃসঙ্গ দ্বীপটিতে জ্বালিয়ে রাখলেন সেই পুরনো স্বপ্নের বাতিঘর। যুবকের জানতে ইচ্ছা হয় কী করে পারলেন তিনি? ক্যাস্ট্রোর নিজ মুখে সে তখন শোনে নাগরদোলায় চড়া তার আশ্চর্য জীবনের গল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

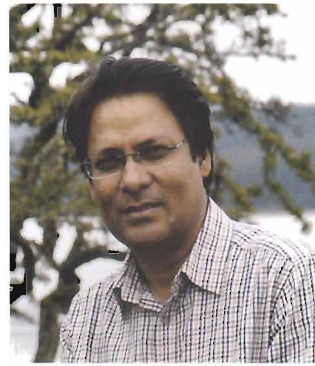

ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনী সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স আয়োজিত কথাসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে প্রকাশিত হয় শাহাদুজ্জামানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' ১৯৯৬ সালে। পরবর্তীকালে গল্প, উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন তিনি। শাহাদুজ্জামানের ব্যতিক্রমী, নিরীক্ষাধর্মী গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি মননশীল পাঠক-পাঠিকা গোষ্ঠী।

শাহাদুজ্জামান পড়াশোনা করেছেন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে। পরবর্তীকালে তিনি নেদারল্যান্ডের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে। পেশাগতভাবে তিনি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে, পরে অধ্যাপনা করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব পাবলিক হেলথে'। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং অধ্যাপনায় যুক্ত আছেন। শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়।

(E-mail : zaman567@yahoo.com)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে

শাহাদুজ্জামান

ঐতিহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

খন্দকার সাখাওয়াত আলী (নাসিম)
প্রিয়জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামানের বই

ছোটগল্প
অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প (মাওলা ব্রাদার্স)
কয়েকটি বিহ্বল গল্প (মাওলা ব্রাদার্স)
পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ (মাওলা ব্রাদার্স)
শাহাদুজ্জামানের গল্প, অগল্প, না গল্প সংগ্রহ (পাঠক সমাবেশ)
কেশের আড়ে পাহাড় (ঐতিহ্য)
Ibrahim Buksh's Circus and Other Stories (Translated by Sonia Amin)
(ইউনিভার্সিটি প্রেস)

উপন্যাস
ক্রাচের কর্নেল (মাওলা ব্রাদার্স)
বিসর্গতে দুঃখ (শ্রাবণ/বাঙলায়ন প্রকাশনী)
খাকি চত্বরের খোয়ারী (বেঙ্গল)

ভ্রমণ
আমস্টার্ডাম ডায়েরি এবং অন্যান্য (জনান্তিক)

গবেষণা
একটি হাসপাতাল, একজন নৃবিজ্ঞানী, কয়েকটি ভাঙা হাড় (মাওলা ব্রাদার্স)

সাক্ষাৎকার
কথাপরম্পরা (পাঠক সমাবেশ)
দূরগামী কথার ভেতর (ঐতিহ্য)

চলচ্চিত্র
চ্যাপলিন, আজো চমৎকার (জনান্তিক)
চলচ্চিত্র, বায়োস্কোপ প্রভৃতি (বাঙলায়ন)
ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস : চিত্রনাট্য (বাঙলায়ন)

অনুবাদ
ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন এবং অন্যান্য অনুবাদ গল্প (ঐতিহ্য)
ভাবনা ভাষান্তর (জনান্তিক)

প্রবন্ধ
শাহবাগ '১৩(আগামী)
লেখালেখি (ঐতিহ্য)
চিরকুট (মাওলা ব্রাদার্স)
টুকরো ভাবনা (মাওলা ব্রাদার্স)

গ্রন্থনা, সম্পাদনা
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি (আগামী)
দেখা না দেখার চোখ (পাঠক সমাবেশ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাংলাদেশের এক যুবকের কথা ভাবি যে দূরের ছোট্ট দ্বীপ দেশ কিউবার দিকে কৌতূহলে তাকায়। গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করে সে দেশের কিংবদন্তি নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বর্ণাঢ্য জীবনকে। মাত্র বছর বত্রিশের এক তরুণ ক্যাস্ত্রো তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে পরাক্রমশালী আমেরিকার একেবারে নাকের ডগায় ঘটিয়ে ফেলেছিলেন এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তারপর আমেরিকার অবিরাম বিরোধিতা আর চোখ রাঙানির ভেতরও টিকিয়ে রেখেছেন সেই বিপ্লবের মন্ত্রকে। একসময় নদীর পাড় ভাঙার মতো পৃথিবীর চারদিকে এক এক করে শোনা গেল সমাজতান্ত্রিক চরাচরের ভাঙনের শব্দ; কিন্তু তবু ক্যাস্ট্রো তার নিঃসঙ্গ দ্বীপটিতে জ্বালিয়ে রাখলেন সেই পুরনো স্বপ্নের বাতিঘর। কোনো পরাশক্তির পরোয়া না করে নতুন অভিযোজনে নতুন সময়কে মোকাবেলা করলেন। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পৃথিবীর মানচিত্রে। যুবকের জানতে ইচ্ছা হয় কী করে পারলেন তিনি ? আমি আমার লেখার মধ্য দিয়ে সেই যুবককে আধো ঘুমের এক স্বপ্ন যাত্রায় মুখোমুখি করে দিই ক্যাস্ট্রোর। ক্যাস্ট্রোর নিজ মুখে সে তখন শোনে নাগরদোলায় চড়া তার আশ্চর্য জীবনের গল্প।

উল্লেখ্য ডকুফিকশন ধারার এই লেখায় কিউবা এবং ক্যাস্ট্রো বিষয়ে সবকটি তথ্য ইতিহাসসম্মত এবং বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে নেয়া। এ লেখায় ব্যবহৃত কিউবা এবং ক্যাস্ট্রো বিষয়ক তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে কিছু বই, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ফিচার ফিল্ম এবং বিবিধ ইন্টারনেট সূত্র থেকে। যে বইগুলো থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো : 'ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যান্ড রিলিজিয়ন : টকস উইথ ফ্রেই বেত্তো', ১৯৮৭, 'ফেইস টু ফেইস উইথ ফিদেল ক্যাস্ট্রে : অ্যা কনভার্সেশন উইথ টমাস বোর্জ', ১৯৯২, এবং 'ফিদেল ক্যাস্ট্রো : মাই লাইফ : ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যান্ড ইগনাশিও রোমেনেট', ২০০৬। এছাড়া কিউবায় ভ্রমনের স্মৃতিচারণের ওপর লেখা আনু মুহাম্মদের 'বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা' ২০১১ বইটি থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে। ক্যাস্টোর জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ২০০৩ সালে নির্মিত অলিভার স্টোন পরিচালিত ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র 'কমানডেন্ট', এবং ২০০১ সালে এসটেলা ব্রাভো পরিচালিত ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র 'ফিদেল : দ্যা আনটোল্ড স্টোরি' থেকে অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে। ১৯৬৪ সালে তৈরি মিখাইল কালাটোজভের 'সোয়ে কিউবা' চলচ্চিত্রটিও তৎকালীন কিউবার প্রেক্ষাপটটি বুঝতে সাহায্য করেছে। সেইসঙ্গে কিউবা এবং ক্যাস্ট্রোর ওপর ইউটিউবে প্রচুর ফুটেজ পাওয়া যায়, সেখান থেকেও নেওয়া হয়েছে প্রায়োজনীয় তথ্য।

বাংলাদেশি যুবক আর ক্যাস্ট্রোর কাল্পনিক এই সাক্ষাৎকার ফিদেল ক্যাস্ট্রো নামের এই বিরল ব্যক্তিটির প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শাহাদুজ্জামান
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ক্যাস্ট্রো ভাবনায় বিভোর বাংলাদেশের যুবকটি একদিন নিজেকে আবিষ্কার করে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর পড়ার ঘরে। দেখে ঘরের এক কোণে বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ছেন তিনি। যুবককে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে আসেন ক্যাস্ট্রো।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাস্ট্রো : এসো এসো, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পথে তোমার কোনো সমস্যা হয়নি তো ?

যুবক : না, না, আমি খুব ভালো আছি। প্রথমেই আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার এই সুযোগটা দেবার জন্য।

ক্যাস্ট্রো : ধন্যবাদের কিছু নেই। তোমার ঐ দেশ, বাংলাদেশ থেকে এতটা পথ আর সাগর পাড়ি দিয়ে কেউ তো আর সচরাচর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। আর আমি তো বরাবরই মানুষের সাথে কথা বলতে পছন্দ করি। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে। আর সবচেয়ে বড় কথা তোমার দেশের সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতিও তো আছে। তাই আমাকে যখন জানানো হলো যে বাংলাদেশের এক যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেছি। বলেছি সরাসরি আমার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিতে।

[ক্যাস্ট্রো এবং যুবক দু'টা চেয়ারে বসে।]

যুবক চেয়ারে বসতে বসতে বলে : আমি জানি বাংলাদেশের সঙ্গে একটা দুঃখজনক স্মৃতি আছে আপনার।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে আমার দেখা হয়েছিল তোমাদের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে। সেটা ১৯৭৩ সাল। তার সঙ্গে একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলবার সুযোগও হয়েছিল আমার। আমি বাংলাদেশের ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলাম। একটা বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার কিছুকাল আগে স্বাধীন হয়েছে তোমাদের দেশ। দেখ আমি নিজে যোদ্ধা তাই যোদ্ধা জাতিকে আমি পছন্দ করি। আমি বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে। মুজিব বলছিলেন তোমাদের দেশে তখন চারদিকে ধ্বংস স্তূপ। নতুন করে গড়তে হচ্ছে সব। আমার মনে আছে মুজিব বলেছিলেন দেশগড়ার দক্ষ লোক পাচ্ছেন না তিনি। তাই বাধ্য হয়ে এমনকি যারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তেমন লোকদের কখনো কখনো বসাতে হচ্ছে প্রশাসনে। কিন্তু আমি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, এ কাজ কক্ষনো করবেন না। দক্ষতার চেয়ে এসময় অনেক বেশি প্রয়োজন দেশপ্রেমের। বলেছিলাম, দক্ষতা না থাকলেও যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে তাদেরই দায়িত্ব দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন। দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলে দক্ষতা তৈরি হতে সময় লাগে না। আমার কিউবার অভিজ্ঞতায় আমি তাই দেখেছি। আমি, চে, কামিলো এরা যখন বিপ্লবের পর দেশের ক্ষমতা নিয়েছি তখন আমাদের সবার বয়স ত্রিশের কোঠায়। আমার তো দেশ পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু আমরা আমাদের দেশপ্রেম দিয়ে সেসব পুষিয়ে নিয়েছি। আমার সঙ্গে যারা পাহাড়ে,জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধ করেছে তাদেরই আমরা তখন দেশের নানা গুরত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বসিয়েছি। যাদের শরীরে দেশের কাদা মাটি লেগে থাকে তারা দেশের সঙ্গে সহজে প্রতারণা করতে পারে না। জানি না মুজিব আমার সেই পরামর্শ আমলে নিয়েছিলেন কিনা।

যুবক : আপনি হয়তো জানেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি বাহিনী বন্দী করে রেখেছিল। তাকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে আপনার মতো একটা জাতিকে মুক্ত করবার জন্য সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তাছাড়া তিনি তো ঠিক আপনার মতো বিপ্লবী গেরিলা নেতাও ছিলেন না। তিনি মূলত গণতান্ত্রিক ধারাতেই সারা জীবন রাজনীতি করেছেন। তবে যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি চেষ্টা করছিলেন নানাভাবে বিধ্বস্ত দেশটাকে গড়ে তুলতে। নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে গড়ে তুলবার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে সুযোগ তো তিনি পেলেন না।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমি জানি, তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

যুবক : হ্যাঁ, তাকে হত্যা করে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছিল। এর পেছনে অবশ্য অনেক আন্তর্জাতিক চক্রান্তও ছিল।

ক্যাস্ট্রো: হ্যাঁ, সে আমি বেশ বুঝতে পারি। আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বলতে আসলে আমেরিকার চক্রান্ত। মুজিব তো আমেরিকার গুড বুকে ছিলেন না। আমি জানি কিসিঞ্জার তোমাদের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে দেবার সব চেষ্টাই করেছিল। আমেরিকা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সবরকম সহায়তা করেছিল, তারা তো সপ্তম নৌবহরও পাঠিয়েছিল। ব্যাপারটা তো খুবই স্পষ্ট যে তখনকার বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো আমেরিকার জন্য মোটেই কোনো সুখের খবর ছিল না। বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছিল রাশিয়া। আমেরিকার ভয় ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সোভিয়েত বলয়ে চলে যাবে। বাংলাদেশেকে সহায়তা দিচ্ছিল রাশিয়ার বন্ধু ভারত। পাকিস্তান ভেঙে গেলে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, যে কিনা আবার রাশিয়ার মিত্র। সুতরাং সব অংক মিলিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকানো ছিল আমেরিকার জন্য অবশ্য কর্তব্য একটা ব্যাপার। এত কিছুর পরও যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তখন তা ছিল সত্যিকার অর্থে আমেরিকার গালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা চড় মারবার মতো। কিসিঞ্জারের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছিল বাংলাদেশ প্রশ্নে। সেটা আমেরিকার জন্য রীতিমতো অপমানের ব্যাপার ছিল। আর তোমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম একজন নেতা যেহেতু ছিলেন শেখ মুজিব, ফলে মুজিবের উপর তাদের রাগ তো ছিলই। মুজিব হত্যার পেছনে সিআইএ'র ভূমিকা, আমেরিকার মদদ ইত্যাদির অনেক প্রমাণই তো পাওয়া যাচ্ছে এখন। মুজিব হত্যার বছর দুয়েক আগে, সেই ১৯৭৩-এ, ঠিক যে বছর আমার সঙ্গে মুজিবের দেখা হলো সে বছরই এইভাবে হত্যা করা হয়েছিল চিলির আলেন্দেকে। সুতরাং আমেরিকার এইসব অপকর্ম করার নজির অনেক পুরনো।

যুবক : শেখ মুজিবের সাথে আপনার সেই সাক্ষাতের সূত্র ধরেই তো বাংলাদেশের একটা চুক্তি হয়েছিল কিউবার সাথে। আর সেই চুক্তিই হয়েছিল আমাদের কাল।

ক্যাস্ট্রো : আমি চেয়েছিলাম তোমাদের এই নতুন স্বাধীন দেশের যোদ্ধা মানুষদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু দেখ আমরা তো একটা ছোট দেশ, কতটুকুই বা সাধ্য আমাদের ? তারপরও আমি চেষ্টা করেছিলাম তোমাদের ঐ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটার অর্থনীতিতে সামান্য একটু ভূমিকা রাখতে। আমি মুজিবের সঙ্গে একটা বাণিজ্য চুক্তি করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেজন্য বাংলাদেশকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল।

যুবক : আমি জানি কিউবা বাংলাদেশ থেকে পাট কিনবে এমন চুক্তি হয়েছিল আর সেজন্যই বাংলাদেশকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল আমেরিকা।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, পাটই তো তখন তোমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল। আমি পাট কিনতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে যাতে সে দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা যোগ হতে পারে। কিন্তু সেটা এক ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনল বাংলাদেশের জন্য। সেটা ১৯৭৪ সাল, তোমাদের দেশে তখন চরম খাদ্য সংকট। আমেরিকা একটা খাদ্য বোঝাই জাহাজ পাঠিয়েছিল তোমাদের দেশে। কিন্তু কিউবার সঙ্গে এই চুক্তির খবর পেয়ে সেই জাহাজ তারা মাঝ সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তুমি হয়তো জান, আমেরিকা কিউবার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে রেখেছে কিউবার বিপ্লবের পর থেকেই। শুধু তাই না, আমেরিকা জানিয়ে দিয়েছে কিউবার সাথে আমেরিকার কোনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক তো থাকবেই না, উপরন্তু অন্য কোনো দেশও যদি কিউবার সাথে কোনো বাণিজ্য করে তাহলে তাদের সঙ্গেও তারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তো সমর্থন করেনি আমেরিকা, তার উপর সেই বাংলাদেশ কিনা আমেরিকার শত্রু কিউবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করছে সেটা তারা বরদাস্ত করবে কেন ? সেজন্যই বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছে আমেরিকা। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রেখে জাহাজ ভর্তি খাদ্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তারা। আমি জানি, না খেতে পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে সেসময় তোমাদের দেশে। নিরন্ন মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে আমেরিকা তার অহঙ্কারকে পরিতৃপ্ত করেছে। আমেরিকার এইসব নির্মমতার সঙ্গে আমার পরিচয় তো দীর্ঘদিনের। এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তো কাটল আমার জীবন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সে আঘাত ছিল মরাত্মক। আমি জানি, মুজিব তখন চেষ্টা করছিলেন পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলোর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক স্থাপনে। অনেকটা সমাজতান্ত্রিক ধারার একটা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু দেরি করে ফেলেছিলেন তিনি। তখন আর ঘটনার সুতা তার হাতে ছিল না। তাকে তো মেরেই ফেলা হলো।

যুবক : হ্যাঁ, তারপর আমাদের দেশের রাজনীতি এক কঠিন চড়াই উৎরাইয়ের পথ ধরল। সে আরেক ইতিহাস। কিন্তু আমি আজ এসেছি আপনার আর কিউবার গল্প শুনতে। আমি জানি আপনাকেও বহুবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি তো আমেরিকার একেবারে দরজার পাশে। অথচ আপনি কেমন অলৌকিকভাবে টিকে আছেন ভয়ংকর এইসব ঝড় ঝাপ্টার ভেতর।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমেরিকা তো আমাকে বহুবার হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। আমি একসময় যে চুরুট খেতাম, সেই চুরুটেও চক্রান্ত করে বিষ মেশানো হয়েছিল। কিন্তু আমি মরিনি। বহাল তবিয়তে আছি। দেখ, এখানে অলৌকিক কোনো ব্যাপার নেই। আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমার জনগণই। আমি আমার জনগণের ভেতর মিশে আছি, তাদের সঙ্গে মিলে অবিরাম যুদ্ধ করে যাচ্ছি। এই দেখছ না আমার গায়ে এখনো গেরিলা ইউনিফর্ম। ঘুমাতে যাবার আগে আমি এটা খুলি না। কারণ আমি মনে করি যতক্ষণ জেগে আছি আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি। আমাকে প্রতি মুহূর্ত খরগোসের মতো সতর্ক হয়ে কান খাড়া রাখতে হয়। আমার কাছে জীবনের প্রতিটা মিনিট মূল্যবান। তুমি আমার তরুণ বয়সের ছবি দেখেছ ?

যুবক : জি দেখেছি। সেখানে কিন্তু আপনার এই বিখ্যাত দাড়ি নেই।

ক্যাস্ট্রো : ঠিক ধরেছ। আমি ঐ প্রসঙ্গেই আসতে চাচ্ছিলাম। আমি এক সময় দেখলাম প্রতিদিন দাড়ি কামাতে আমার দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় ব্যয় হয়। ভেবে দেখলাম এই দশ/পনেরো মিনিট আমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছে একটা অদরকারি কাজে। আমি বরং এই সময়টা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে পারি। ফলে দাড়ি কামানো বাদ দিলাম। বাড়তে থাকল দাড়ি কিন্তু আমার দিনটাও খানিকটা বড় হলো এই সুবাদে। এই জটিল রাজনীতির পৃথিবীতে টিকে থাকা প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের ব্যাপার। জীবনের ফাঁক ফোঁকর থেকে যেভাবেই হোক তাই সময় বের করে নেওয়া দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : আমি আপনার সেই সংগ্রামের গল্পই শুনতে এসেছি। কত কিছু জানবার আছে আপনার কাছ থেকে, কিউবার কাছ থেকে। কিন্তু জানি না এতটা সময় আপনার আছে কিনা, আপনার শরীর তাতে সায় দেবে কিনা।

ক্যাস্ট্রো : তুমি হয়তো জান যে আমি এখন কিউবার রাষ্ট্রীয় সব দায়িত্ব থেকে সরে এসেছি। বয়স তো আমার কম হলো না। আমেরিকা তো বসে আছে কবে আমি মরব। ওরা ভাবছে আমি মরলেই বুঝি কিউবাকে তারা তাদের মতো করে দখল করে নেবে। কিন্তু তাদের সে আশা মিটবে না, আমি খুব ভালো করেই জানি। আমি থাকি বা না থাকি কিউবার মানুষ তাদের মর্যাদা নিয়ে লড়াই করবে এটা আমি নিশ্চিত। আমার থাকা না, থাকার উপর যে কিউবার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে না সেটা বোঝাবার জন্যই তো আমি সরকারের দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলো থেকে সরে এসেছি। সুতরাং আমার ব্যস্ততা এখন আগের চেয়ে অনেকটা কম। তাছাড়া ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে বিশ্রামেও থাকতে হয়। তুমি একটা ভালো দিনেই এসেছ। আজ আমার আর কোনো কাজ নেই। তোমার সঙ্গেই কথা বলব। আর তুমি হয়তো শুনে থাকবে কথা বলার ব্যাপারে আমার সুনাম বা দুর্নাম যাই বলো না কেন, বেশ আছে। আমার বক্তৃতাগুলো তো হয় খুব লম্বা। এক সময় আমি টানা ছয়, সাত ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি। জাতিসংঘে যেবার প্রথম কিউবাকে প্রতিনিধিত্ব করতে গেলাম সেবার ঐ অধিবেশনে আমি চার ঘণ্টার একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। জাতিসংঘে এত লম্বা বক্তৃতা আর কেউ দিয়েছে কিনা আমার জানা নাই। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, কথা বলাতে আমার ক্লান্তি নেই। তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। বলো কী জানতে চাও ?

যুবক : জানতে তো চাই অনেক কিছু, সবকিছু। শুরুতে আপনার ছেলে বেলা, আপনার বাবা-মার কথা বলুন।

ক্যাস্ট্রো : আমার পরিবারের কথা বলবার আগে, তোমাকে কিউবার পুরনো ইতিহাসের কিছু কথা বলি, তাহলে আমার পরিবারের অনেক ব্যাপারও তোমার বুঝতে সুবিধা হবে।

যুবক : হ্যাঁ, তাহলে তো খুব ভালো হয়।

ক্যাস্ট্রো : [দেওয়ালে একটা বিশ্বমানচিত্রের দিকে নির্দেশ করে] তুমি নিশ্চয়ই চিনতে পাচ্ছ, ঐ বিশাল সমুদ্রের বুকে ছোট্ট ঐ যে দ্বীপটি ওটাই হচ্ছে কিউবা। এর উত্তরে ঐ তো দেখতে পাচ্ছ আমেরিকা। আমাদের এই দ্বীপ থেকে মাত্র ৯০ মাইলের পথ। একটা নৌকা দিয়েই পাড়ি দেওয়া যায়। বুঝতেই পারছ আমরা একেবারে আমেরিকার নাকের ডগায়। আমাদের পশ্চিমে এই হলো ম্যাক্সিকো আর দক্ষিণে ঐ হচ্ছে হাইতি, ডোমিনিকা আর জ্যামাইকা। আর পূর্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ তো দেখছ শুধু অথৈ পানি। ঐ অথৈ পানি বেয়েই কিন্তু স্প্যানিশ জাহাজ নিয়ে এই মাটিতে এসেছিল কলম্বাস। অনেকেই কিন্তু একটা কথা জানে না যে কলম্বাস তার জাহাজ নিয়ে প্রথম এসে ভিড়েছিল এই কিউবার মাটিতেই। ওরা বলে কলম্বাস আবিষ্কার করেছে নিউ ওয়ার্ল্ড, নতুন পৃথিবী। ওরা যাকে নতুন পৃথিবী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল বাস্তবিক সেটা ছিল এই কিউবা। কলম্বাস তো যাত্রা শুরু করেছিল আসলে তোমাদের ঐ অঞ্চলে যাবার জন্য। ইন্ডিয়ায় যাবার জন্য। এই কিউবাতে নেমে কলম্বাস ভেবেছিল বুঝি সে ইন্ডিয়াতেই পৌঁছে গেছে। তার ঐ ভুল ভাঙাল পরে আরেক ইতালির লোক, যার নাম আমেরিগো ভেস পুসি। সেও কলম্বাসের মতো বেরিয়েছিল ইন্ডিয়া যাবার জন্য। তখন তো সবার চোখ ঐ ইন্ডিয়ার দিকে কারণ ইন্ডিয়া তখন খুব সম্পদশালী দেশ। এখন যেমন ইন্ডিয়া, বাংলাদেশের লোক ভাগ্যান্বেষণে ইয়োরোপে পাড়ি জমায়, তখন ইয়োরোপের লোকেরা ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমাত ইন্ডিয়ার দিকে। ইতিহাসের গতি কত পাল্টায়। কলম্বাস, আমেরিগো ভেস পুসি এরা সবাই সেইসব ভাগ্যান্বেষণীর দলে। কলম্বাস যে জায়গায় গেছে সেটা যে ভারত না আমেরিগো ভেস পুসিই তা সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। সে-ই জানিয়েছিল যে এটা একটা নতুন পৃথিবী। তার নাম অনুসারেই এই নতুন পৃথিবীর নাম হয়েছিল আমেরিকা।

কলম্বাস যখন কিউবার মাটিতে পা দেয় তখন এখানে মাছ ধরে, ফসল ফলিয়ে বেশ ভালোই দিন কাটাচ্ছিল এই মাটির আদিবাসীরা। যাদের নাম ছিল তায়নো আর সিবোনো। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে কলম্বাস এই মাটিতে পা রাখবার বছর খানেকের মাথায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এই আদিবাসীরা। নিশ্চিহ্ন হয়েছিল মূলত দুটো কারণে। কলম্বাস যে ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সাথে করে নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না কিউবান আদিবাসীদের। প্রাচীন মডেলের হলেও তাদের বন্দুকের সামনে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়াতেই পারেনি কিউবার আদিবাসীরা। হাজার হাজার আদি কিউবান হত্যা করেছে কলম্বাসের দল। আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কলম্বাসের দল এমন কিছু রোগ কিউবার মাটিতে নিয়ে এসেছিল যার সঙ্গে কিউবার মানুষের কোনো পরিচয় ছিল না, যেমন ম্যালেরিয়া, বসন্ত এসব রোগের কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতায়ই ছিল না এ অঞ্চলের মানুষের। ফলে এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে এইসব রোগে। কলম্বাস আর তার দলবলের নিয়ে আসা ঐ অস্ত্র আর রোগের আঘাতে কয়েক বছরের ভেতরেই ৯৫ ভাগ আদিবাসী বিলুপ্ত হয়ে যায় কিউবার মাটি থেকে। এভাবেই অন্য সব ইয়োরোপীয়রা তথাকথিত নতুন পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করেছে, তারপর লুট করেছে এখানকার সোনা আর শস্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ এই নতুন পৃথিবীতে ছিল আজটেক, মায়া, ইনকার মতো জাতি যাদের নগরসভ্যতা ছিল যেকোনো ইয়োরোপীয় নগরের চেয়েও উন্নত। ওরা বলে কলম্বাস নাকি আমেরিকা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি কে আসলে কাকে আবিষ্কার করেছে ? আমি তো বলব আদিবাসী তায়নো আর সিবোনোরাই আবিষ্কার করেছিল এক বর্বর কলম্বাসকে। স্পেনের রানির বদান্যতাতেই কলম্বাস পেয়েছিল ঐ জাহাজগুলো আর সেই জাহাজ দৈবক্রমে এসে ভিড়েছিল আমাদের এই মাটিতে। সেই থেকে এই মাটি চলে গেল স্পেনের দখলে। কিউবার মাটি তো মাটি নয় চিনির দানা। তুমি হয়তো জান যে কিউবার সবচেয়ে বড় ফসল হচ্ছে আখ। সত্যি বলতে পৃথিবীর বিরাট অংশকে কিন্তু চিনি খাওয়ায় এই কিউবাই। পৃথিবীর চিনির সিংহভাগ সরবরাহ করে কিউবার আখ ক্ষেতগুলো আর আছে আমাদের তামাক। হাভানার চুরুটের কথা তো তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ।

যুবক : হ্যাঁ, একসময় তো আপনার ঠোঁটেও অবিরাম থাকত সেই চুরুট।

ক্যাস্ট্রো : তা ঠিক। চুরুট ছিল আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। কিন্তু আমি যখন জনগণকে ধূমপান বন্ধ করতে অনুরোধ করলাম তখন আমি নিজেও ছেড়ে দিলাম চুরুট খাওয়া। নিজে একটা জিনিস চর্চা না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া তো ভণ্ডামি। ফলে আমি নিজে প্রথমে একেবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে চুরুট ছাড়লাম তারপর জনগণকেও ধূমপানের ক্ষতির কথা বললাম। যাহোক, বলছিলাম কিউবার অতীতের কথা। স্প্যানিশরা কিউবার মাটি দখল করে নিল ঠিকই কিন্তু সেই আখ আর তামাক ফলাবার লোক পাবে কোথায় ? আদিবাসীরা তো সব মরে সাফ। স্পেনিশরা তখন আফ্রিকা থেকে দাস আনতে শুরু করল। তারপর কিউবার লোক বলতে দাঁড়ালো সেই স্পেনিশ প্রভু, আফ্রিকার দাস আর কোনো রকম বেঁচে বর্তে যাওয়া আদিবাসী তায়নো আর সিবোনো কিছু মানুষ। সেই যে ১৫৯২ সালে কলম্বাসের জাহাজ এসে ভিড়ল আমাদের মাটিতে সেই থেকে আমরা হয়ে পড়লাম স্পেনের অধীন। স্পেনই শাসন করতে থাকল আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী। প্রায় তিনশো বছর পর সবে সেই ১৮৯৫ সালে এসে প্রথমবারের মতো হোসে মার্তির নেতৃত্বে স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিউবা।

যুবক : আমি হাভানার অনেক জায়গায় হোসে মার্তির মূর্তি দেখেছি।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ মার্তি তো আমার জীবনের, এই কিউবার মানুষের জীবনের জন্য এক বিরাট অনুপ্রেরণা। আমাদের আরও এক অনুপ্রেরণা সাইমন বলিভার, যিনি ভেনিজুয়েলার সন্তান। তার মূর্তিও তুমি দেখবে কিউবায়। এই বলিভারই মার্তির আগে পুরো ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তির জন্য লড়েছিলেন। তবে হোসে মার্তি ছিলেন কিউবারই মানুষ। কিউবার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তিনি। তার সম্পর্কে তোমাকে পরে আরও বলবো। আপাতত এইটুকুই বলি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পেনের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমেছিলেন, যদিও জিততে পারেননি, নিহত হয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেই।

আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীরা প্রধানত ব্রিটিশ অভিবাসী। তারা এক পর্যায়ে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সম্রাটের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে নিজেদের একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। তো ব্যাপার হচ্ছে আমেরিকা হয়ে গেছে একটা স্বাধীন দেশ অথচ তার হাতের নাগালের ভেতরের ছোট্ট একটা দ্বীপ কিউবা তখনও স্পেনের দখলে। ব্যাপারটা আমেরিকার কাছে বেখাপ্পা। তাই কিউবার উপর তখন থেকে আমেরিকার নজর। তারা ভাবল আমাদের কাছের এই মাটিটুকু কেন দূরের সেই স্পেনের দখলে থাকবে, এটা থাকা উচিত আমাদের দখলে। আমেরিকা তখন স্পেনকে প্রস্তাব করল তারা টাকা দিয়ে স্পেনের কাছ থেকে কিউবাকে কিনে নেবে। সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। সেসময় আমেরিকা এমন অনেক রাজ্য, শহর কেনাবেচা করেছে। আজকের যে ঝলমলে নিউইয়র্ক শহর এটা তো ছিল নেদারল্যান্ডের দখলে। আমেরিকা টাকা দিয়ে ঐ শহরটাকে কিনে নিয়েছিল। যাহোক, এমন রেওয়াজ তখন ছিল। আমেরিকা প্রস্তাব দিলেও স্পেন কিউবাকে বিক্রি করতে রাজি হলো না। এতে করে একটা উত্তেজনার জন্ম হলো। নিজেদের সীমানার এত কাছে এভাবে স্পেনের একটা উপনিবেশ থাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করল আমেরিকা। ফলে তারা বিকল্প পথ খুঁজতে লাগল। মওকা খুঁজতে থাকল কী করে কিউবাকে আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া যায়।

বলা যায় সেই সুযোগটা আমেরিকা পেল অনেকটা কাকতালীয়ভাবে যখন স্পেনের বিরুদ্ধে হোসে মার্তি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হোসে মার্তির আক্রমণে স্পেন বেশ নাজুক তখন। সেই মওকায় আমেরিকা কিউবায় ঢুকে পড়ল তার সৈন্যদল নিয়ে আর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল স্পেনের সঙ্গে। স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতেই নিহত হলেন আন্দোলনের নেতা মার্তি। কিন্তু মার্তির স্বাধীনতাযুদ্ধকে হাইজ্যাক করে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ল স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে। সেটা ১৮৯৮ সাল। শুরু হলো আমেরিকা আর স্পেনের যুদ্ধ। চার বছর স্থায়ী সেই যুদ্ধে পরাজিত হলো স্পেন। আর এভাবেই কিউবার দখল তখন চলে গেল আমেরিকার হাতে। আর কিউবার নিরীহ মানুষদের জন্য হলো প্রভু বদল। আগে প্রভু ছিল স্পেন, এবার হলো আমেরিকা। ১৯০২ সালে আমেরিকা কিউবা থেকে স্পেনকে হটিয়ে দিলেও নিজেরা ঠিক কিউবার শাসন ভার গ্রহণ করল না। তারা বরং কিউবাতে একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দূর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল কিউবার অর্থনীতি, রাজনীতি, নিরাপত্তা। কিউবার ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা ঘটল। সেই থেকে শুরু কিউবার উপর আমেরিকার আধিপত্য। তাদের ভাবটা ছিল এমন যে, আমরা তোমাদের স্প্যানিশ দখল মুক্ত করেছি এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কথা মতো চলা, আমাদের গোলামি করা। কিউবার তথাকথিত সেই সব পুতুল সরকার আমেরিকার গোলামি করে গেছে বছরের পর বছর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অস্ত্র তুলে নিয়েছি।

যুবক : আমি আপনার সেই অস্ত্র তুলে নেওয়ার গল্পেই ফিরে আসতে চাই। তার আগে আপনার ছেলেবেলাটার কথাও কিছু শুনতে চাই।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, তুমি আমার পরিবারের কথা জানতে চাইছিলে। আমার মা কিন্তু কিউবার আদিবাসী সন্তান। কলম্বাস আর তার সঙ্গীদের হত্যা যজ্ঞের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গুটিকয় সেই আদিবাসীর বংশধর তিনি। মা ছিলেন গরিব এক কৃষক ঘরের মেয়ে। পড়াশোনা জানতেন না। মা'র নাম লিনা। আর আমার বাবা ছিলেন স্প্যানিশ। বাবার নাম এঞ্জেলো ক্যাস্ট্রো। তোমাকে বলছিলাম ১৮৯৫ তে হোসে মার্তির স্পেনের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহের কথা, যুদ্ধ ঘোষণার কথা। সেই বিদ্রোহ ঠেকাতে স্পেন সরকার কিউবাতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। সেইসঙ্গে বেশ কিছু তরুণকে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিউবায় যুদ্ধ করতে। আমার বাবা ছিলেন সেই স্বল্প প্রশিক্ষণ পাওয়া এক তরুণ স্প্যানিশ সৈনিক। মজার ব্যাপার দেখ আমার বাবা কিন্তু আমার গুরু হোসে মার্তিকে দমন করবার জন্যই কিউবাতে এসেছিলেন। আমার বাবা অবশ্য অত কিছু খবর রাখতেন না। তিনি হুকুম তামিল করতে এসেছিলেন কিউবাতে। একপর্যায়ে স্পেনে ফিরে যান তিনি। কিন্তু কিউবা তার মনে দাগ কেটেছিল। তিনি বেশ কয়েক বছর পরে আবার ফিরে এসেছিলেন কিউবাতে।

AMARBOI.COM

কিউবাতে তখন তিনি ফিরে এসেছিলেন অবশ্য মূলত অর্থনৈতিক কারণে। আমার বাবাও ছিলেন স্পেনের দরিদ্র এক কৃষক পরিবারের সন্তান। সামান্য কিছু লেখা পড়া জানতেন। তিনি তো নিয়মিত কোনো সৈনিকও ছিলেন না। তাকে একরকম ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিউবায় যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ শেষে স্পেনে ফিরে তিনি বেকার হয়ে পড়েছিলেন, আমার দাদারও তেমন কোনো জমিজমা, সম্পত্তি ছিল না। এদিকে বাবা স্পেনে ফিরবার কিছুকাল পরেই কিউবা দখল করে নেয় আমেরিকা। আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তখন কিউবার বিশাল বিশাল জমিগুলো দখল করে শুরু করেছে আখ চাষ, বসাচ্ছে বড় বড় সব চিনির কল। বাবা খোঁজ পেলেন কিউবাতে তখন আমেরিকান কোম্পানিগুলোতে প্রচুর কাজ। তাছাড়া বাবা বলতেন কিউবার প্রকৃতি, মানুষও তাকে টেনেছিল খুব। তো বাবা একরকম খালি হাতেই স্পেন থেকে চলে এলেন কিউবাতে। সেটা ১৯০৫-৬ সালের দিকে হবে। তিনি এসে শ্রমিক হিসেবে কাজ জুটিয়ে নিলেন এক আমেরিকান চিনির কারখানায়। বাবা ছিলেন খুব পরিশ্রমী, উদ্যমী মানুষ। এসময় স্পেনে তার গ্রামের বাড়ি থেকে আরও অনেক তরুণকে কিউবায়ে নিয়ে আসেন বাবা। তাদের নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দল তৈরি করেন। সেসময় এক এক করে অনেক আমেরিকান কোম্পানি আসছে কিউবাতে। তাদের দরকার চাষযোগ্য জমি। বাবা সেইসব কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করলেন জমি সাফ করে দেবার। বাবা তার দল নিয়ে আমেরিকার কোম্পানির জন্য বড় বড় জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা সব কেটে সাফ করে চাষ উপযোগী করে দিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে বাবা বেশ মুনাফা করতে লাগলেন। একসময় নিজেই জমি কিনতে শুরু করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাবা কিন্তু অনেক জমির মালিক হয়ে যান এবং রীতিমতো বেশ বড়লোক হয়ে ওঠেন। বাবার সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল চমৎকার।

যুবক : আপনার ভেতরের এই নেতৃত্বের গুণাবলি তাহলে আপনার বাবার কাছ থেকেই এসেছে বলা যায়।

ক্যাস্ট্রো : বাবার টাকা কামানোর গুণাবলি না পেলেও, সংগঠন করবার গুণটা তার কাছ থেকেই পেয়েছি বোধ হয়। আমার মা'র সঙ্গে বাবার যখন পরিচয় হয় তখন বাবা বেশ ধনাঢ্য মানুষ। অনেক জমিজমা, খামার তার। রীতিমতো ভূস্বামী। কিন্তু আমার মা ছিলেন দরিদ্র ঘরের মেয়ে। প্রেমে পড়েছিলেন তারা। প্রেম তো আর টাকা, পয়সা জমি জমা চেনে না। তো আমার জন্ম হলো ১৯২৬ সালে ১৩ অগাস্ট। মা বলেছিলেন আমার জন্ম হয়েছিল রাত দু'টার সময়, খুব ঝড় বাদলের মধ্যে। বুঝতেই পাচ্ছ আমি ঝড় বিরেতে অনেকটা গেরিলার মতোই এসেছিলাম পৃথিবীতে। আর ঐ ২৬ সংখ্যাটারও কিন্তু একটা তাৎপর্য আছে আমার জীবনে। ১৯২৬ সালে জন্মেছিলাম, আবার আমরা প্রথম যে মনকাড়া আক্রমণ করেছিলাম সেটা ছিল ২৬ জুলাই। আমাদের দলটার নামই তো হয়ে দাঁড়িয়েছিল '২৬ জুলাই আন্দোলন'। আবার দেখ আমার জন্ম তারিখ ১৩ কে দ্বিগুন করলে হয় ২৬। যাহোক, আর বোধহয় না এগুনোই ভালো। আমাকে অদৃষ্টবাদীদের মতো শোনাবে। কিন্তু স্রেফ একটা খেলা হিসেবে ভাবতে মজাই লাগে।

যুবক : আপনার বাবা-মা তখন কিউবার কোন অঞ্চলে থাকতেন ?

ক্যাস্ট্রো : আমাদের বাড়ি ছিল কিউবার উত্তর মধ্য অঞ্চলে ওরিয়েন্ট প্রদেশে। জায়গাটার নাম বিরান। ওটা একটা গ্রামই বলা চলে। অল্প কয়টা দালান ছিল সেখানে। একটা ধুলো ধূসরিত বড় রাস্তা ছিল, যা চলে গিয়েছিল মিউনিসিপাল শহরটার দিকে। আর ছিল একটা পোস্ট অফিস, ছিল একটা প্রাইমারি স্কুলও। আমার বাবা আমাদের বাড়িটা বানিয়েছিলেন স্পেনীয় ধরনের। স্পেনের গ্যালিসীয় অঞ্চল থেকে এসেছিলেন বাবা। সেখানে নিয়মিত বন্যা হতো বলে সেখানকার বাড়িগুলো হতো সব খুঁটির উপর। কিউবাতে কোনো বন্যা না হলেও বাবা গ্যালিসিয়ার প্রতি তার নস্টালজিয়া থেকেই কিউবার বিরান্যে আমাদের বাড়িটা বানিয়েছিলেন খুঁটির উপর। ঐ এলাকায় এমন আর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িও ছিল না। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম আমাদের বাড়িটা ওমন খুঁটির উপর কেন ? সে রহস্য অবশ্য খোলাসা হয়েছে অনেক পরে। আমাদের বাড়ির নিচে ঐ ফাঁকা জায়গায় ঘুমাত আমাদের গরুগুলো। গোটা ত্রিশেক গরু ছিল আমাদের। ছোট বেলার স্মৃতিতে মনে পড়ে– গরুগুলো সারাদিন গ্রাম চরে বেরিয়ে সন্ধ্যায় চুপচাপ এসে বসত ঐ খুঁটিগুলোর নিচে। ঐ খুঁটির নিচে অনেক হাঁস মুরগিও থাকত। আমাদের বাড়ির পাশে বাবা মোরগের লড়াইও আয়োজন করতেন। এটাও ছিল বাবার স্প্যানিস ঐতিহ্যের প্রতি টানের আরেকটা নমুনা। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই দুটাই জনপ্রিয়। ষাঁড়ের লড়াই তো আর আয়োজন করতে পারতেন না, করতেন মোরগের লড়াই। বাড়ির কাছেই ছিল কলার বাগান আর লেবুর বাগান, এগুলোরও মালিক ছিলেন আমার বাবা। আর ছিল অনেক নারকেল গাছ।

যুবক : বোঝা যাচ্ছে চমৎকার একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে কেটেছিল আপনার শৈশব।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমার বাবা পাহাড়ি এলাকাতেও অনেক জমি লিজ নিয়েছিলেন। ঘন পাইন বনে ঢাকা লাল মাটির পাহাড়। আমার বাবার ঘোড়াও ছিল। মনে আছে আমার বয়স যখন ১০/১১ বছর তখন প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে ঐ পাহাড়গুলোতে উঠতাম। পাহাড়গুলোতে উঠতে ঘোড়াগুলোর খুব কষ্ট হতো কিন্তু উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘাম বন্ধ হয়ে যেত, মুহূর্তে গা শুকিয়ে যেত। চমৎকার ঠান্ডা বাতাস বইত সে চূড়ায় পাইন গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ছোট ছোট ঝরনার পানি ছিল বরফ শীতল সুমিষ্ট। আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা ছিল ওটা। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এখনও আমার চোখে ভাসছে সেই পাইন বন। ঐ পাহাড়ের নিচে এক প্রান্তে ছিল হাইতিয়ানদের পাড়া। ওখানে থাকত হাইতি থেকে আসা সব দরিদ্র কৃষক। তারা অধিকাংশ আমার বাবার খামারেই কাজ করতেন।

যুবক : বোঝা যাচ্ছে আপনার বাবা দরিদ্র কৃষক থেকে বেশ বড় সড় একজন ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিলেন।

ক্যাস্ট্রো : স্পেনের গেলিসিয়ায় যেখানে আমার বাবা জন্মেছিলেন সেখানকার একটা ছবি আমার কাছে আছে। ছোট্ট এক রুমের একটা বাড়িতে থাকতেন পুরো পরিবার। তাদের এক কণা জমিও ছিল না। সেখান থেকে এসে আমার বাবা কিউবাতে কয়েকশো হেক্টর জমির মালিক হয়েছিলেন। কী করে নিজের উদ্যোগে এবং আমেরিকানদের যোগ সাজসে তিনি এত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন সেটা একটা গবেষনার ব্যাপার। আমি যখন হাভানা ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়তে যাই তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন মূলত এই ভাবনা থেকে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বাবার সম্পত্তিগুলো রক্ষার জন্য আইনি সহায়তা দিতে পারব। তিনি অবশ্য বিপ্লবের আগেই মারা গেলেন। বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো কষ্টই পেতেন কারণ তার সব জমি আমি তো দিয়ে দিয়েছিলাম রাষ্ট্রের কাছে। তবে আমার বাবা ভূস্বামী হলেও টাকা পয়সার গর্ব কিন্তু করতেন না কখনো।তার খামারে যে দরিদ্র কৃষকরা কাজ করতেন তাদের প্রতি খুব সদয় ছিলেন তিনি, নানাভাবে সাহায্য করতেন তাদের। ছোটবেলায় আমি প্রায়ই হাইতিদের ঐ পাড়ায় যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। হাইতির কৃষকদের দরিদ্র জীবন আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। মজার ব্যাপার কি জানো সে সময় আমার বয়সী ছেলেরা আমাকে ডাকত ইহুদি বলে।

যুবক : আশ্চর্য, তা কেন ?

ক্যাস্ট্রো : আসলে আমার নাম নিয়ে বেশ একটা জটিলতা হয়েছিল। আমার নাম যে ফিদেল হলো সেটা এক মজার কাহিনি। তুমি তো জান খ্রিষ্টানদের নাম রাখা হয় ব্যাপটাইজ করার মধ্য দিয়ে। আমার মা ছিলেন খুব ধার্মিক। যিশুসহ আরও নানা সাধু সন্তদের মূর্তিতে ভরা ছিল আমাদের ঘর। নানা সংস্কার ছিল তার। বাড়ির পাশে পেঁচা ডাকলে তিনি খুব ভয় পেতেন, বিপদের আশঙ্কায় প্রার্থনা করতেন, মানত করতেন। আমার বাবা ধর্ম কর্ম কিছু না করলেও মা সবকিছু ধর্মমতে করবার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। তিনি একেবারে প্রথা মাফিক ব্যাপটাইজ করে আমার নাম রাখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। জন্মের পর আমাদের সবারই একজন গড ফাদার বা ধর্মপিতা ঠিক করা হতো। তখন তো লোকের আয়ু ছিল কম। নানা অসুখ বিসুখে মারা যেত তারা। তো বাবা মারা গেলে সেই ধর্মপিতা সন্তানের দেখা শোনা করবেন এটাই ছিল নিয়ম। আমার ধর্মপিতা করা হয়েছিল আমার বাবার এক বড় লোক বন্ধুকে। খুবই ধনী ব্যবসায়ী তিনি। লোকে তাকে কোটিপতি বলত। নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপটাইজ অনুষ্ঠানে ধর্মপিতাকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং তার নামের একটা অংশ আমার নামের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু সেই কোটিপতি ব্যবসায়ী তার ব্যবসার কাজে একবার হাভানা, একবার সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে দৌড়ে বেড়াতেন। তিনি আমার ব্যাপ্টাইজ অনুষ্ঠানের জন্য কোনো সময়ই দিতে পারছিলেন না। আর ওদিকে আমার বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল। আমার বয়স যখন পাঁচ তখনও আমার কোনো আনুষ্ঠানিক নাম নেই। যেহেতু আমার ব্যাপ্টাইজ হয়নি ফলে ছেলেরা সব আমাকে ইহুদী বলে ডাকত। আমি কিন্তু বহুদিন ইহুদি শব্দটার অর্থ জানতাম না। আমি যখন খুব ছোট তখন কেউ ইহুদি বললে ভাবতাম ওটা বোধহয় কোনো পাখির নাম। তারপর আরেকটু বড় হয়ে ভাবলাম যাদের নাম থাকে না তাদেরকেই বুঝি ইহুদি বলা হয়। তো আমি একরকম নাম বিহীন ভাবেই পাঁচবছর পার করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসময় আমার বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে। হাভানার পর ওটাই কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। বাবার পরিচিত এক শিক্ষিকার বাড়িতে থাকবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। সেখানে আমার ভালো পড়াশোনা হবে এই কথা চিন্তা করে। এসময় আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপ্টাইজ করে আমার নাম রাখা জরুরি হয়ে পড়ল। আমার ধর্মপিতা যেহেতু আর সময় দিতেই পারছেন না তখন নতুন ধর্মপিতা খোঁজা হলো। ঐ শিক্ষিকা অবিবাহিত ছিলেন। তখন তার বোনের স্বামী একজন হাইতিয়ান সরকারি চাকুরেকে আমার ধর্মপিতা করা হলো। সেই হাইতির ভদ্রলোক ছিলেন ছোটখাটো চাকুরে। ফলে আমার ধর্মপিতা শেষ পর্যন্ত কোটিপতি না হয়ে হলেন এক দরিদ্র হাইতিয়ান। তবে মজার ব্যাপার হলো কাগজে কলমে সেই হাইতির ভদ্রলোক আমার ধর্মপিতা হলেও যেহেতু আমার ধর্মপিতা হিসেবে সেই কোটিপতির নামই আগে ঘোষণা করা হয়েছিল ফলে তার নামটিই যুক্ত করা হলো আমার নামের সঙ্গে। তার নাম ছিল ফিদেল সান্টোস। সেই অনুযায়ী আমার বাবার পদবী মিলিয়ে আমার নাম হলো ফিদেল ক্যাস্ট্রো। অথচ আমার অফিসিয়াল ধর্মপিতা হচ্ছেন সেই হাইতির লোক যার নাম লুই হিকর্ট।

যুবক : তাহলে আপনার নাম লুই ক্যাস্ট্রো হতে পারত ?

ক্যাস্ট্রো : তা হতে পারত। না হয়ে অবশ্য ভালোই হয়েছে। ইতিহাসে তো প্রচুর লুই আছে। তবে সেই কোটিপতি ফিদেল যার নামে নাম রাখা হয়েছিল আমার তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে সামান্যই। খুব বড়লোক হলেও তিনি ছিলেন কৃপন লোক। ছেলেরা গডফাদারদের কাছ থেকে নানা উপহার পায়, সেই লোক আমাকে কখনো কোপ উপহার দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না আমার। তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। তার সূত্রে খুব ছোটবেলায় রাজনীতির একটা কৌতূহলোদ্দীপক পাঠ হয়েছিল আমার। সেই প্রসঙ্গে আসবার আগে সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে আমি যে শিক্ষিকার বাড়ি গেলাম সেখানকার জীবন সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলি। কারণ সেখানে গিয়ে জীবনের নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার।

যুবক : জি বলুন, আপনার জীবনের এই বাঁকগুলো সম্পর্কেই তো জানতে চাই।

ক্যাস্ট্রো : আমি যখন ঐ শিক্ষিকার বাড়ি গেছি তখন ১৯৩১-৩২ সাল। আমেরিকায় তখন বড় অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। আমার সেই শিক্ষিকা নিয়মিত বেতন পেতেন না তখন। ভীষণ এক দরিদ্র অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন তারা। আমার বাবা আমার খরচ বাবদ সেই শিক্ষিকাকে কিছু টাকা পাঠাতেন। আমি এক পর্যায়ে টের পেলাম সেই টাকা দিয়েই পুরো সংসার চালাতে শুরু করেছেন সেই শিক্ষিকা। ঘরে ছিল সেই শিক্ষিকার বৃদ্ধ বাবা, আরও এক বোন, সেই সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি। আমার একার জন্য পাঠানো টাকায় খাবার ব্যবস্থা হতো ঐ চারজনের। তিন বেলা খাওয়া হতো না। দু বেলা সামান্য করে খেতাম আমি। সেই প্রথম আমার না খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতা হলো। কিন্তু সেই শিক্ষিকা আমার বাবাকে এসব বলতেন না, আমিও ছিলাম খুব ছোট। ফলে বাবাকে এসব বলবার সাহস পাইনি। কথা ছিল ঐ শিক্ষিকা আমাকে ঘরে রেখে পড়াবেন কিন্তু তিনি তেমন কিছু পড়াতেন না।

আমাকে বরং বর্ণমালা শিখিয়েছেন, অংক শিখিয়েছেন সেই শিক্ষিকার বোন আমার ধর্মপিতার স্ত্রী। সেই বোন চমৎকার পিয়ানোও বাজাতেন। কিন্তু ঐ শিক্ষিকা তখন কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। তার ঝড়টা যেত আমার উপর। তবে মজার ব্যাপার দারিদ্র্য থাকলেও সেই পরিবারের আবার নানারকম কেতাদুরস্ত ভাব ছিল। ভেতরে অবস্থা বেশ করুণ হলেও বাইরে তারা একটা অভিজাত ভাব করতেন। তারা নিজেদের ভেতর ফরাসি ভাষায় কথা বলতেন, ঘরে কথা বলতেন নিচু স্বরে। ঘরে সবাইকে নানা রকম আদব কায়দা মেনে চলতে হতো। ঘরের এইসব নানারকম নিয়ম কানুন ঠিকমতো মেনে চলতে না পেরে কখনো কখনো সেই শিক্ষিকার হাতে চড় থাপড়ও খেয়েছি। আমার নিজের বাড়ি, প্রিয় জায়গাগুলো ছেড়ে জীবনে প্রথম বাইরে এসেছিলাম আমি। কিন্তু এসে পেয়েছিলাম এমনই একটা অনাত্মীয় পরিবেশ। এ সবকিছু মিলিয়ে আমি খুবই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম সেখানে। এই বাড়িতেও শান্তি নেই, বাবাকেও কিছু বলতে পারছি না। ঐ অল্প বয়সে এটা ছিল খুব বড় একটা মানসিক চাপ। কীভাবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেটা নিয়ে ভাবতাম আমি। শেষে মনে মনে ভেবে একটা উপায় বের করলাম। আমি এক পর্যায়ে সেই শিক্ষিকার বাড়ির সব নিয়মগুলো ইচ্ছা করে ভাঙতে শুরু করলাম। যেমন ঘরের ভেতর খুব নিচু স্বরে কথা বলার নিয়ম কিন্তু আমি জোরে জোরে কথা বলতে লাগলাম, ঘরে ফরাসি বলা নিয়ম কিন্তু আমি ফরাসি শিখতে অস্বীকৃতি জানালাম। বলতে পার এইটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম একটা বিদ্রোহ। আমার এধরনের আচরণের কথা আমার বাবাকে জানান সেই শিক্ষিকা। আমি তখন বাবাকে সব কথা জানিয়ে দিই। আমার বাবা সবকিছু জেনে খুব ক্ষেপে যান ঐ শিক্ষিকার উপর। তাকে রীতিমতো গালাগালি করেন এবং আমাকে তার বাড়ি থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেন একটা বোর্ডিং স্কুলে। আমি ঐ শিক্ষিকার বাড়িতে প্রায় বছর দুয়েক ছিলাম।

যুবক : ঐ দু'বছর তাহলে একরকম অপচয়ই হলো আপনার ?

ক্যাস্ট্রো : না, সেটাকে ঠিক অপচয় বলব না। জীবনে অনেক শিক্ষা হলো আমার। ঘরের ভেতরের দারিদ্র্য আমি কাছ থেকে দেখলাম। দেখলাম দারিদ্র্য মানুষকে কী করে সংকীর্ণ করে দেয়। দারিদ্র্য কী করে মানুষকে মিথ্যা বলতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। দেখলাম কী করে এই দারিদ্র্যের ভেতরও মানুষ আবার তার আভিজাত্যকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। আর ঐ বাড়িতেই তো সেই শিক্ষিকার বোনের হাতে শিখলাম আমি বর্ণমালা, অংক। অংকটা সত্যিই আমি খুব ভালো শিখেছিলাম। এখনও আমি মুখে মুখে অনেক অংক করতে পারি। তো জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকেই আমি অপচয় মনে করি না। সেখান থেকে শিক্ষা নিই ভবিষ্যতের জন্য।

যুবক : এরপর সেই বোর্ডিং স্কুলে কেমন কাটল আপনার ?

ক্যাস্ট্রো : বোর্ডিং স্কুলে গিয়েই তো আমি প্রথম একটা যথার্থ স্কুল পেলাম। ক্লাস রুম, ডেস্ক, খেলার মাঠ। সত্যিকার স্কুল জীবন শুরু হলো আমার। কিন্তু সত্যি বলতে সেখানকার পরিবেশও খুব ভালো ছিল না। ওখানকার শিক্ষকরা খুব কড়া ছিলেন। কথায় কথায় ছাত্রদের লাঠি দিয়ে পেটাতেন, চড় থাপ্পড় মারতেন। আমার খুবই অপছন্দ ছিল সেটা। অবশ্য আমাকে অধিকাংশ শিক্ষক বেশ খাতির যত্ন করতেন। কারণ তারা জানতেন আমার বাবা বেশ বড়লোক। আমি ধনী লোকের ছেলে বলে আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হতো দেখতাম আমার ক্লাসের দরিদ্র পরিবারের একটা ছেলের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে না, তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। এসব আমার খুব অন্যায় মনে হতো। সেই ছোটবেলাতেই এসব দেখে আমার ভেতর একটা ক্ষোভ জন্ম হতো। এটা যে খুব আদর্শিকভাবে কিছু বুঝতাম তা তো নয়। আমার শুধু মনে হতো এরকম বৈষম্যমূলক আচরণ মোটেও ঠিক না, এটা অন্যায়। আমি এই ন্যায় অন্যায় বোধটা আসলে পেয়েছিলাম আমার মা'র কাছ থেকে। আমার মা নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তার ন্যায় অন্যায় বোধ ছিল খুব প্রখর। তিনি সবসময় আমার কানে কতগুলো কথা ঢুকিয়ে দিতেন, বলতেন, কোনভাবেই মিথ্যা কথা বলবি না, কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না আর সবাইকে সমান মর্যাদা দিবি। এইসব কথা একবারে মন্ত্রের মতো ঢুকে গিয়েছিল আমার মনের ভেতর। ফলে স্কুলে যখন এইসব বৈষম্য দেখতাম তখন ভেতরে ভেতরে মন বিদ্রোহ করত। যেসব শিক্ষকদের আমার পছন্দ হতো না, তাদের সঙ্গে অকারণে তর্ক করতাম। আমার বাবার কাছে নালিশ গেল। বাবা আমাকে গালমন্দ করলেন। কিন্তু আমিও জেদ ধরলাম ঐ স্কুলে আর পড়তে চাই না।

বাবা আমার কথা রাখলেন। শেষে আমাকে ভর্তি করা হলো সান্টিয়াগো ডু কিউবার খুব অভিজাত একটা মিশন স্কুলে। স্কুলটার নাম কলেজ ডু ডোলারেস। যাজকদের স্কুল। ওখানে অবশ্য ধনী দরিদ্রের এই প্রভেদ থাকল না। কারণ শুধু ধনী লোকদের ছেলেরাই পড়তে যেত সেই স্কুলে। সেটাও বোর্ডিং স্কুল। এদিকে আমার বাবা সান্তিয়াগো ডু কিউবাতে তার আরেক বন্ধুকে করেছিলেন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয় অভিভাবক। তিনিও এক বড়লোক ব্যবসায়ী। এই নতুন মিশন স্কুলটি ছিল অনেক সুশৃঙ্খল। নানা নিয়ম কানুনে বাধা আর নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো সেখানে। তবে যেহেতু সেটা একটা মিশন স্কুল, ফলে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা ছিল সবকিছুর মূলে। আমাদের নিয়মিত চার্চে যেতে হতো, প্রতি সকালে উঠে প্রার্থনা করতে হতো। চোখ বুজলে এখনও আমি সেই চার্চের প্রার্থনা সংগীতগুলো শুনতে পাই।

যুবক : এধরনের ধর্মীয় শিক্ষা কি আপনাকে কোনভাবে প্রভাবিত করেছে ?

ক্যাস্ট্রো : না ওগুলো কিন্তু আমাকে তেমন প্রভাবিত করেনি। ঐসব প্রার্থনা আমার কাছে ছিল নেহাত একটা রুটিনের মতো। তবে বাইবেলের নানা কাহিনি আর নুহের নৌকার গল্প এসব আমার বেশ মজাই লাগত। আর ঐ মিশনারি স্কুলে ছেলেদের শরীর চর্চার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। আমি খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম বেসবল, বাস্কেটবল আর ফুটবলে। বিশেষ করে বেসবল আর বাস্কেটবল আমাকে পেয়ে বসেছিল। স্কুলে আমি যে বাস্কেটবল দলে ছিলাম মনে আছে সে দলকে চ্যাম্পিয়ান বানাবার জেদ চেপেছিল আমার। আমি আমাদের গেমস শিক্ষককে অনুরোধ করেছিলাম বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে একটা বাতি দিয়ে দিতে যাতে রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাবার পর আমি প্রাকটিস করতে পারি। শিক্ষক সে ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আমি অনেক রাত জেগে প্রাকটিস করতাম। এমন জেদ আমার বরবরই ছিল। আমরা সত্যিই চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম সেবার। আমি তো কিছুদিন আগে পর্যন্তও মাঠে গিয়ে বাস্কেটবল আর বেসবল খেলেছি। এখন শরীরের জন্য আর পারি না। কিউবার ন্যাশনাল বেসবল টিম যখন প্রাকটিস করত তখন আমি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলেছি। তুমি হয়তো জান বেসবল আর বাস্কেটবলের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কিউবা শ্রেষ্ঠ টিমগুলোর মধ্যে একটা। তো স্কুলের ঐ খেলাধুলা আমার খুব পছন্দের ছিল। আর আমার পছন্দ ছিল পাহাড়ে ওঠা। আমাদের ঐ স্কুলের চারপাশে ছিল পাহাড়। আমাদের ঐ পাহাড়ে ওঠার প্রতিযোগিতা হতো। আমি খুব ভালো করতাম তাতে। কত দুর্গম পাহাড়ে যে আমি একা একা উঠেছি তার হিসাব নেই। একটা কোনো উঁচু পাহাড় দেখলেই আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত ওটার চূড়ায় উঠবার জন্য। এক একটা পাহাড়কে আমার এক একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হতো। চূড়ায় পা রাখাটা আমার জন্য একটা নেশার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যুবক : আপনি তো পরে এমন একটা পাহাড় থেকেই আপনার গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন ?

ক্যাস্ট্রো : ঠিক তাই। স্কুলে ঐ পাহাড়ে চড়া প্রাকটিসগুলো আমার মনকাড়া পাহাড়ের গেরিলা যুদ্ধে খুব কাজে লেগেছিল। ঐ মিশনারি স্কুল তো আর তখন টের পায়নি যে তারা আসলে একজন ভবিষ্যৎ গেরিলাকেই ট্রেনিং দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : ঠিকই বলেছেন। তো আপনার কৈশোর কি তাহলে সেই মিশনারি স্কুলেই কেটেছে ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, তাই। সেই সময়ই কিউবার সমাজটাকেও একটু একটু করে বুঝতে শিখছি আমি। বিশেষ করে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা বৈষম্যগুলোকে। তোমাকে বলছিলাম যে সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে বাবার এক বন্ধু আমার স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন। অত্যন্ত ধনী লোক ছিলেন তারা। আমি দেখেছি তাদের অঢেল বিত্ত বৈভব, বিলাসী জীবন। বাবার সেই বন্ধু আমার উপর খুব চাপ প্রয়োগ করতেন যাতে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হই। সেটা যত না করতেন আমার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি করতেন তার নিজের মর্যাদার জন্য। আমি পরীক্ষা ভালো করলে তিনি গর্ব করে বলতে পারবেন যে তিনি আমার অভিভাবক। আমি কোনো পরীক্ষা ভালো না করলে বাবা আমার জন্য যে পকেট মানি তার কাছে পাঠাতেন সেখান থেকে তিনি টাকা কেটে রাখতেন। অন্যদিকে ছুটিতে যখন দেশের বাড়ি যেতাম তখন দেখতাম মানুষের আরেক রূপ। বাবার খামারে কাজ করত যে দরিদ্র কৃষকরা তাদের দুর্দশার জীবন আমি কাছ থেকে দেখতাম। তোমাকে বলেছি যে গ্রামে আমার বন্ধু ছিল সেই গরিব ঘরের ছেলে মেয়েরাই। ওদের সঙ্গে খেলতাম, ওদের বাড়িতে গিয়ে খেতাম। আমি দেখতাম শুধু মাত্র একটা দিনের খাবার ব্যবস্থা করতেই কী নাভিশ্বাস উঠছে তাদের। আমি ধনবান ঘরের ছেলে হলেও কিউবার শ্রেণি বৈষম্যকে খুব কাছ থেকে চিনবার সুযোগ পেয়েছি।

আমার বাবার সেই আরেক কোটিপতি বন্ধু যিনি আমার ধর্মপিতা ছিলেন সেই ফিদেল সান্টোস প্রায়ই নির্বাচনে দাঁড়াতেন। তার বিশেষ কোনো দল ছিল না। যখন যে দল ক্ষমতায় যেত সেই দলে যোগ দিতেন তিনি। মনে আছে একবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি আমাদের ঐ অঞ্চল থেকেই। নির্বাচনে তাকে সহায়তার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। ভূস্বামী হওয়াতে এলাকাতে বাবার একটা প্রভাব ছিল। তিনি বহু মানুষকে কাজ দিতেন, জমি দিতেন ফলে ভোটের উপর তার একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। বাবার মনোনীত প্রার্থীকেই তার এলাকার লোকেরা ভোট দিত। বাবা তার সেই বন্ধুকে সমর্থন দিতেন নিঃস্বার্থ ভাবেই। এই নির্বাচন থেকে বাবার লাভবান হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। নেহাত বন্ধুকৃত্য করতেন। বন্ধুর সমর্থনে নানা রকম প্রচারের ব্যবস্থা করতেন তিনি। তোমাকে একটা মজার ব্যাপার বলি। সেসময় তো টিভি রেডিওর প্রচারণার ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামে চটপটে, বাকপটু কিছু লোক থাকত, প্রার্থীরা তাদের ভাড়া করত, যে বেশি ভাড়া দিতে পারত সেইসব লোক সেই প্রার্থীর পক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচারণা চালাত। আমার বাবা সেবার অনেক টাকা দিয়ে সেইসব পেশাদারি প্রচারকদের ভাড়া করেছিলেন বাবার সেই বন্ধুর পক্ষে প্রচার চালাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার একটা স্মৃতি বেশ মনে আছে। আমি তখন স্কুলের ছুটিতে আর এদিকে নির্বাচনের প্রচারণা চলছে। আমাদের বাড়িতে যে ঘরটায় আমি ঘুমাতাম সেখানে ছিল একটা বড় সিন্দুক। সেখানেই বাবার টাকা পয়সা সব থাকত। আমার মনে আছে সেই ঘরে ঘুমানো আমার জন্য এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ভোর পাঁচটা থেকে কারা যেন ঐ ঘরে এক এক করে ঢুকত আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ঐ সিন্দুকটা খুলতো। আসলে ভোর থেকে অধীনস্ত কর্মচারী ঐ সিন্দুক থেকে টাকা বের করে ঐ পেশাদার প্রচারকদের দিত। বুঝতেই পাচ্ছ একেবারে ছোটবেলা থেকেই কিউবার গণতন্ত্রের চেহারাটা আমার বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে আমি নিজের মতো করে নিচ্ছিলাম আমার রাজনীতির পাঠ।

যুবক : তারপর আপনি তো সরাসরি রাজনীতিতে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়, তাই না ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলাম হাভানা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর। তোমাকে আগেই বলেছি আমার রাজনীতির প্রথম অনুপ্রেরণা কিউবার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হোসে মার্তি। আমার রাজনীতির কথা বলবার আগে এসো মার্তির লেখা একটা গান শুনি। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি মার্তির এই গান আমরা সবসময় গাইতাম। 'গুয়েনতামেরা' নামের এ গানটা এখনও তুমি শুনতে পাবে।[ক্যাস্ট্রো রেকর্ড প্লেয়ারে 'গুয়েনতামেরা' গানটা চালিয়ে দেন।]

মার্তি ছিলেন কিউবার শত্রু বাইরের পরাধীনতার বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, বিপ্লবী। স্পেনের বিরুদ্ধে একটা ছোট সশস্ত্র দল নিয়ে তিনি প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সেই ১৮৯৫ সালে। তোমাকে বলেছি যে যুদ্ধ করতে করতেই নিহত হন তিনি। মার্তি ছিলেন আমাদের রাজনীতি সচেতন তরুণদের গভীর অনুপ্রেরণার মানুষ।

আমি তো হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম আইন বিষয়ে পড়তে। সেটা চল্লিশ দশকের শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়। আমেরিকা তখন জেঁকে বসে আছে আমাদের দেশের উপর। দেশ চালায় আমেরিকার তাঁবেদার এক সরকার। তার মন্ত্রীরা সব কোটিপতি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। সমাজের পদে পদে দুর্নীতি। কিউবা তখন বাইরের পৃথিবীর কাছে শুধু ক্যাসিনোসহ নানারকম জুয়া, বেশ্যালয় আর অপরাধ জগতের স্বর্গরাজ্য। একদিকে আনন্দ ফুর্তি আর পয়সা ওড়ানোর জগৎ। আর অন্যদিকে চিনি কারখানার শ্রমিক আর আখ খামারের কৃষকদের দুর্বিষহ জীবন। কিউবার রাজনীতি, অর্থনীতি তখন সব নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকা। আমার মনে আছে সংবাদপত্র, রেডিওতে দেশের প্রধানমন্ত্রী কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হতো কিউবায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কী বলেছেন তার খবর। কিউবার অর্থনীতি কীভাবে পুরোটা আমেরিকার দখলে ছিল তার একটা হিসাব দেই তোমাকে। যেমন ধরো, পঞ্চাশ দশকে কিউবার আখ খামারের ৪০ ভাগ ছিল আমেরিকার কোম্পানির অধীনে, আমাদের সামান্য যে খনিজ সম্পদ আছে তার ৯০ ভাগ ছিল আমেরিকার স্বত্বাধিকারীরদের হাতে আর তেল ক্ষেত্রগুলোর ৮০ ভাগ ছিল ওদের হাতে। কিউবার সরকার আর গুটিকয় ব্যবসায়ীকে ভাগ দিয়ে আমেরিকার পুঁজিপতিরা চুটিয়ে ব্যবসা করছিল কিউবায়। কিউবার সম্পত্তির উপর কিউবার জনগণের কোনো অধিকার ছিল না।

সেই সাথে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মগজ ধোলাই চলছিল। স্কুল, কলেজে, পত্রিকার লেখালেখিতে অবিরাম দেখানো হতো যে আমেরিকা কতটা মহান, তারা কীভাবে কিউবাকে স্পেনের ঔপনিবেশিক কবল থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছে। সেইঅর্থে আমেরিকা কিউবার ত্রাতা। সুতরাং এই ত্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু সত্যি ব্যাপার হচ্ছে স্পেনের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন মার্তি, আমেরিকা নয়। তোমাকে বলেছি যে সত্যিকার অর্থে মার্তির সেই আন্দোলনকেই হাইজ্যাক করেছিল আমেরিকা। কিন্তু জনমনে এমন একটা প্রচারণা অবিরাম করা হতো যে আমেরিকা পাশে না থাকলে কিউবার আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। অতএব প্রচার করা হতো যে আমেরিকাকে সমঝে চলতে হবে। পত্রপত্রিকায় আমেরিকাকে দেখানো হতো বিশাল পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে। তারা আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতিকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা যেন তাদের প্রাপ্য। সেইসাথে এ ধারণাও খুব চালু ছিল যে আমেরিকার মতো এমন শক্তিশালী একটা দেশের বিরুদ্ধে কিউবার মতো চুনোপুটি একটা দেশের কিছু করা, কিছু বলা হাস্যকর।

যুবক : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি এই বাস্তবতার প্রতিবাদ করত না ?

ক্যাস্ট্রো : অবশ্যই করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রতিবাদী দলগুলোর সঙ্গেই তো যুক্ত হয়েছিলাম আমি। ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কয়টা দেশে তখন আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট সরকার। আমি যখন ছাত্র আমাদের একেবারে কাছের দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিকে আমেরিকার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করল এক জেনারেল। কলাম্বিয়াতেও একইরকম ঘটনা ঘটল। আমাদের হাভানা ইউনিভার্সিটিতে তখন অনেক ডোমিনিকান আর কলাম্বিয়ান ছাত্র পড়ত। তারা এইসব স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছিল, আমি যোগ দিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে। ডোমিনিকান প্রেসিডেন্ট ভবন দখল করবার জন্য একটা সশস্ত্রদল জাহাজে কিউবা থেকে রওনা দিলে আমি সেই দলে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু ডোমিনিকান সেনাবাহিনী সেই জাহাজে আক্রমণ করলে অনেকেই মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। আমি জাহাজ থেকে সাগরে লাফিয়ে সাঁতরে বেঁচে যাই। কলাম্বিয়ার পুলিশের অস্ত্রগার দখল করবার জন্যও একটা ছাত্রদের দল গিয়েছিল কলাম্বিয়ায়, আমি সেই দলেও যোগ দিয়েছিলাম। সুতরাং আমার সশস্ত্র বিদ্রোহের মহড়া বেশ আগেই শুরু হয়েছিল বলতে পার।

একবার হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড় ছাত্র আন্দোলন হয় বাস ভাড়া বাড়ানোকে কেন্দ্র করে। কিউবার প্রেসিডেন্ট তখন রেমন গ্রাউয়ের, যার সরকার একেবারে আগাগোড়া দুর্নীতিতে মোড়া। একপর্যায়ে সরকার বাস ভাড়া অনেক বাড়িয়ে দিলে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের একটা বড় কারণ হচ্ছে বাসে যাতায়াত করত মূলত ছাত্র আর নিম্ন আয়ের মানুষেরাই। আমি সেই আন্দোলনে খুব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। আমি বক্তৃতা দিতে পারতাম ভালো। তোমাকে বলেছি যে লম্বা বক্তৃতার ব্যাপারে আমার সুনাম বা দুর্নাম যাই বল না কেন সেটা বেশ আছে। তো বাস ভাড়া কেন্দ্রিক সেই আন্দোলনে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে আমি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম তখন। বলতে পার ঐ আন্দোলনের ভেতর দিয়েই আমি কিউবার রাজনীতির মঞ্চে সরাসরি আবির্ভূত হই।

যুবক : আপনি কি তখন কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন ?

ক্যাস্ট্রো : আমি যোগ দিয়েছিলাম কিউবান পিপলস পার্টিতে। সৎ, বোদ্ধা মানুষদের ভেতর খুব জনপ্রিয় ছিল দলটি। তারা মূলত সরকারের দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার এসব নিয়ে সোচ্চার ছিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান এডুয়ার্দো চিবাস তখন খুব জনপ্রিয় ছিলেন কিউবাতে। আমি ধীরে ধীরে চিবাসের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম এবং একপর্যায়ে তার প্রধান সহকারী হয়ে উঠেছিলাম। ছাত্র অবস্থাতেই স্থির করে ফেলেছিলাম রাজনীতিই হবে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ। ১৯৫০এ আমি হাভানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাস করি। পুরোপুরি রাজনীতিতে সক্রিয় হবার আগে আমার ইচ্ছা ছিল পলিটিক্যাল ইকোনমিতে উচ্চতর একটা ডিগ্রি নেওয়ার। আমি রাজনৈতিক অর্থনীতিটাকে আরও ভালোভাবে বুঝে নিয়ে তারপর রাজনীতিতে পুরোপুরি নামব ঠিক করেছিলাম। আমি পলিটিক্যাল ইকোনমিতে পড়বার জন্য তখন একটা স্কলারশিপ যোগাড়ের চেষ্টা করছিলাম। আর এই সময়টাতে আমি বিয়েও করে ফেলেছিলাম।

যুবক : আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কথা তো আমরা বেশি জানতে পারি না। আপনার স্ত্রীর কথা কি একটু বলবেন।

ক্যাস্ট্রো : ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি আসলে কথা বলি না। তবে আমার সেই প্রথম স্ত্রীর কথা বলতে পারি। সে ছিল আমার তারুণ্যের প্রথম প্রেম। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম মিত্রা। আমাদের ইউনিভার্সিটিরই দর্শন বিভাগের ছাত্রী ছিল সে। খুবই সুন্দরী। ছেলেরা সব তার প্রেমে পড়ত। আমিও পড়েছিলাম এবং সে আমাকেই বিয়ে করেছিল তখন। মিত্রা ছিল ধনী পরিবারের মেয়ে। শুনে অবাক হবে, আমি যে বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করেছিলাম সেই বাতিস্তা ছিল মিত্রাদের পারিবারিক বন্ধু। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বিয়েতে বাতিস্তা একটা উপহারও পাঠিয়েছিল। বাতিস্তা কি আর জানত তখন যে সে তার শত্রুর কাছে উপহার পাঠাচ্ছে। আমার আর মিত্রার একটা ছেলেও হয়েছে। মিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে অবশ্য আর শেষ পর্যন্ত টেকেনি। আমি ক্রমশ যে বিপজ্জনক জীবনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম সে জীবন দিয়ে সংসার করা চলে না। মিত্রার পর আরও কিছু নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার, যারা ছিলেন আমার সহযোদ্ধা কিন্তু তাদের কারো সঙ্গেই স্থায়ী কোন সম্পর্ক হয়নি আমার। আমি আমার সেই ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগতই রাখতে চাই। আমি বরং আমার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কথা বলতেই বেশি আগ্রহী। বলছিলাম আমার রাজনীতির জীবনের শুরুর কথা। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তখন সবে সংসার জীবন শুরু করেছি, পরিকল্পনা করছি স্কলারশিপ নিয়ে পড়ত যাব। সব কিছু মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে তারপর নামব রাজনীতির মাঠে এমনই ছিল ভাবনা। কিন্তু জীবনকে নিয়ে যত হিসাব নিকাশই করি না কেন, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সব হিসাবই তো এলোমেলো হয়ে যায়। আমার জীবনের হিসাবও উলট পালট হয়ে যায় একের পর এক ঘটে যাওয়া কতগুলো ঘটনায়। প্রথমেই বেশ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

AMARBOI.COM

যুবক : কী রকম ঘটনা ?

ক্যাস্ট্রো : দেখ আমার জীবন তো নাটকীয় আর অতিনাটকীয় সব ঘটনাতেই ভরা। এ ঘটনাটা ঘটল আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পরের বছরই। আমি তখন কিউবান পিপল পার্টির নেতা এডুয়ার্দো চিবাসের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। পরের বছর ১৯৫২ তে কিউবাতে নির্বাচন হবার কথা। চিবাসও প্রার্থী হবেন এবং তিনি খুব শক্ত একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন তেমনই ধারণা ছিল সবার। এসময় তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চিবাস দুর্নীতির কতগুলো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তোলেন। সরকার তখন চিবাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চিবাসকে তার অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে বলেন। কিন্তু চিবাস তার অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতে পারেননি। চিবাস তখন একটা রেডিও স্টেশন চালাতেন। জনপ্রিয় ছিল সেই রেডিও স্টেশনটি। এই রেডিও স্টেশনের মাধ্যমেই তিনি তার দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন চালাতেন। একদিন আমাকে বললেন তার সঙ্গে রেডিও স্টেশনে যেতে। বললেন তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর দুর্নীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে রেডিওতে বক্তব্য রাখবেন। আমি তার সঙ্গে রেডিও স্টেশনে গেলাম। তিনি সরকারের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে আবেগঘন বক্তৃতা দিলেন রেডিওতে। তিনি সরকারের যে দুর্নীতির দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছেন তার কিছু কিছু যে তিনি প্রমাণ দিতে পারেননি সেটা স্বীকার করলেন; তবে উদাত্ত কণ্ঠে কিউবার জনগণকে বললেন কোনো একটা বিশেষ দুর্নীতির প্রমাণ তিনি দিতে পারেন বা নাই পারেন কিউবার জনগণ যেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যান। তার বক্তৃতা তখন রেডিওতে লাইভ অন এয়ারে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ তার পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমি কিন্তু রেডিও স্টুডিওতে তার পাশেই। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম; কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে ব্যক্তিগত অপমান বোধ থেকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একটা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সেই আত্মহত্যা সংঘটিত করে তিনি জনগণকে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ ঘটনা তখন খুবই তোলপাড় করেছিল সারা কিউবাকে। কিউবার রাজনীতির অনেক খুঁটিনাটি ইতিহাস তোমাকে বলতে শুরু করেছি।

যুবক : আমি খুবই আগ্রহের সঙ্গে তা শুনছি। আমরা তো কিউবার ইতিহাসের চড়াই উৎরাই অনেক কিছুই জানি না। আর বিপ্লবপূর্ব কিউবার পরিস্থিতির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেরই তো প্রচুর মিল আছে। আমি আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার নিজের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মেলাচ্ছি। জানতে চাই তারপর কী ঘটল ?

ক্যাস্ট্রো : চিবাসের মৃত্যুর পর কিউবান পিপলস পার্টি আমাকে পার্টির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করে। কিন্তু আমি রাজি হয়নি।

যুবক : কী কারণে ?

ক্যাস্ট্রো : কারণ কিউবান পিপলস পার্টির সাথে একটু একটু করে আমার ইতোমধ্যেই একটা মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। চিবাস মনে করতেন দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলেই কিউবায় শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু আমি তখন টের পাচ্ছিলাম এটা খুব সরলীকৃত একটা ধারণা। কিউবান পিপলস পার্টি রাজনীতির বড় ছবিটা দেখতে পেত না। দুর্নীতির সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ককে তারা যুক্ত করত না, সমস্যার মূলে যে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সেটা তারা মানত চাইতে না। কিন্তু আমি ইতোমধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছি। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ে আমার কাছে সবকিছু খোলাসা হয়ে গেছে। আমি খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে শুধুমাত্র দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পরিবর্তন কিউবাতে আনা যাবে না। সমস্যার একেবারে গভীরে হাত দিতে হবে।

যুবক : আপনি কি এসময়ই কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হলেন ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছরগুলোতে নানা বিপ্লবী সাহিত্য পড়তে গিয়েই মার্কস, লেনিনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই, কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হই। মজার ব্যাপার হচ্ছে আইনের ছাত্র হিসেবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিষয়ে পড়তে গিয়ে আমার মনে হতো এর বিকল্প একটা অর্থনীতি অবশ্যই হওয়া উচিত, হতে পারে। আমি নিজেই সাম্যবাদী অর্থনীতির একটা খসড়া ঠিক করেছিলাম। তারপর যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়লাম তখন উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ করলাম আমার মনের কথাগুলোই যেন আরও সুন্দরভাবে গুছিয়ে স্পষ্ট করে এখানে বলা হয়েছে। সত্যি বলতে মার্কসের লেখা পড়বার আগেই আমি মনে মনে ছিলাম মার্কসবাদী। আমি একজন ইউটোপিয়ান কমিউনিস্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আগেই তোমাকে বলেছি মার্কস পড়বার আগে আমি ছিলাম মার্তির অনুসারী। স্বাধীনতার জন্য তার আত্মত্যাগকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম। তার সাহসিকতা, আত্মমর্যাদা, বীরত্ব ছিল আমার অনুপ্রেরণা। আমি মনে করি মার্তির চিন্তার ভেতর এমন কিছু চমৎকার ব্যাপার আছে যে, কেউ তার ধ্যান ধারণাকে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করে অনায়াসে মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারে।

মার্কস আর মার্তি দুজনের নামই তো শুরু 'ম' দিয়ে। দুজনের ভেতর কিন্তু মিল আছে অনেক। মার্তি আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণি বৈষম্যের কথা বলেছেন। এর থেকে মুক্তির পথের কথা ভেবেছেন। মার্কস এই অবস্থাগুলোরই একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার ধারণা মার্তি যদি আরও বেঁচে থাকতেন, তেমন পরিবেশ পেতেন তাহলে তিনিও মার্কসের সিদ্ধান্তগুলোতেই পৌঁছাতেন। আসলে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ে আমার চিন্তার অনেক জট খুলে যায়। চারপাশে যা ঘটছে তার জন্য যে শুধু ব্যক্তিগত আচরণ, নৈতিকতা এগুলোই দায়ী না, আছে আরও বড় অনেক শর্ত সেগুলো আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষের সমাজ গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটা আমি বুঝে উঠি। শ্রেণি বৈষম্যের পেছনের কারণগুলো আমার কাছে খোলাসা হতে থাকে। আর সত্যি বলতে কিউবায় বসে শ্রেণি বৈষম্য বুঝতে তো বৈজ্ঞানিক হবার দরকার নেই, মাইক্রোস্কপ, টেলিস্কোপের দরকার নেই। চোখ খুললেই তখন যে কেউ দেখতে পেত একদল না খেয়ে আছে আর আরেক দল এত খাবার কোথায় রাখবে তার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। আর ঐ দুই চিত্র আমার চেয়ে কে আর বেশি দেখেছে বল ? প্রাচুর্য আর দারিদ্র্য আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আসলে কারো ভেতরে যদি বিদ্রোহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণটা থাকে, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা থাকে, সেইসঙ্গে সে যদি কোনো আদর্শের সংস্পর্শে এসে এই জগৎকে দেখবার একটা নতুন দৃষ্টি অর্জন করে তাহলে তার ভেতর একটা আশ্চর্য বোধোদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে আমার বেলায় তেমনটা ঘটেছিল। নিমেষে আমি যেন একটা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলাম। আর মার্কস যে কমিউনিস্ট সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছেন কিউবার মতো এত দুর্দশা আর বঞ্চনায় জর্জরিত একটা দেশের জন্য এরচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন আর কী হতে পারে বল ?

যুবক : আপনি বলছিলেন, কিউবার পিপলস পার্টির সাথে আপনার মতাদর্শগত অমিল হয়েছিল। আপনি তো তাহলে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে পারতেন, আমি যদ্দুর জানি তখন তো কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ছিল।

ক্যাস্ট্রো : ভালো প্রশ্ন করেছ, খুবই যথার্থ প্রশ্ন। হ্যাঁ, কিউবাতে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এবং আমি চাইলে তাতে যোগ দিতে পারতাম অবশ্যই। আমি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাদের সঙ্গে আমার খুবই ভালো যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরও আমি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখিনি। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সীমাবদ্ধতা আমি লক্ষ করেছি। শ্রমিকদের ভেতর তাদের ভালো কার্যক্রম ছিল, তাদের অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিল কিন্তু তারা ছিল বৃহত্তর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের ভেতর নানা প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল। সমাজ পরিবর্তন বিষয়ে তাদের কতগুলো অনড় ধারণা ছিল। শ্রেণি সংগ্রামকে তারা খুব যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করত। আমার মনে হতো জনগণের ভেতর যে সুপ্ত বিশাল বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আছে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি এদের নেই।

তাদের সাথে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। আমি বলতাম এই মুহূর্তেই সমাজতন্ত্রকে আশু লক্ষ করে ধ্রুপদী ধরনের শ্রেণি সংগ্রাম করবার কোনো দরকার নেই। আমি বলতাম সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকা সকল অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট মানুষকে আমাদের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যে মানুষগুলোর হয়তো স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই কিন্তু যারা একটা পরিবর্তন চান তারাই জনগণের সবচেয়ে বড় অংশ। এই মানুষগুলোকে ধাপে ধাপে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাবার কথা বলতাম আমি। আর সবচেয়ে বড় কথা তখন কিউবার সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রের নামে, কমিউনিজমের নামে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বই সব জায়গায় তখন সমাজতন্ত্রকে মানুষের জন্য ঘোর অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তারা প্রচার করত দেশে সমাজতন্ত্র হলে তারা সবার ঘর বাড়ি, সম্পত্তি কেড়ে নেবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষকদের জমি কেড়ে নেবে। এমনকি ওরা এও বলত কমিউনিস্টরা পরিবার ভেঙে দেবে আর ঘরের মেয়েদের করবে যৌথ সম্পত্তি। আর কমিউনিস্টরা ঈশ্বর মানে না এ প্রচার তো বরাবর ছিলই। তখন কিউবায় বহু মানুষ ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল; কিন্তু তারা ঠিক জানতই না কমিউনিজম ব্যাপারটা আসলে কী। আমি কিন্তু দেখতাম মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য আর প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগছে। এই ভোগা শুধু বৈষয়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থেও। তারা এই ঘোরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। তাই কমিউনিজমের ভীতিকে পাশ কাটিয়ে আমি সব স্তরের জনগণকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিম্ন মজুরি, রাজনৈতিক দুর্নীতি এইসব ইস্যুতে একত্রিত করার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রচলিত ধারার ক্যাডার ভিত্তিক শ্রেণি সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হবার ব্যাপারে অনড় ছিল। ফলে আমি তাদের ভেতর আর কোনো সম্ভাবনা দেখিনি। আমি তখন বিকল্প বিপ্লবী কৌশল খুঁজতে থাকি। এই সময়ে কিউবার ইতিহাসে নেমে আসে আরেক কালো অধ্যায়।

যুবক : আপনি কোন অধ্যায়ের কথা বলছেন ?

ক্যাস্ট্রো : কিউবার নির্বাচন হবার কথা ছিল ১৯৫২ সালে তোমাকে আগে বলেছি। কিন্তু সেই নির্বাচন বানচাল করে একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে কিউবার ক্ষমতা দখল করে জেনারেল বাতিস্তা। ফলে সব হিসাব নিকাশ যায় পাল্টে। আমি টের পাই কিউবার উপর নেমে এল এক ঘোর অন্ধকার। কিউবার ভবিষ্যৎ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। কিউবা এমনিতেই অধঃপতিত হচ্ছিল, এবার সেই অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হলো। আমি যে ভাবছিলাম আরও কিছুটা পড়াশোনা করে, প্রস্তুত হয়ে ধীরে সুস্থে রাজনীতিতে নামব, সেই বিলাসিতার সুযোগ আর রইল না। আমার মনে হলো দেরি করবার এক মুহূর্ত সময় আর আমার নেই। আমাকে মাঠে নামতে হবে এখনই।

যুবক : প্রিয় ফিডেল, আমার দেশও এমন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, এমনি স্বৈরশাসনের কবলের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছে। আমি শুনতে চাই কীভাবে মোকাবেলা করলেন আপনি সেইসব বাস্তবতা। আমি জানি আমি অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠছি। কিন্তু আপনার নিজের মুখ থেকে সেইসব গল্প শুনবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না।

ক্যাস্ট্রো : আমারও তোমার সঙ্গে কথা বলতে মন্দ লাগছে না। তুমি আমাকে আমার সেই পুরনো দিনগুলোতে নিয়ে গেছ। তবে একটা কথা শুরুতেই বলে রাখি আমরা যে পথে এ বাস্তবতা মোকাবেলা করেছি অন্য দেশও যে এই পথে এগুবে তার কোনো কথা নেই। যার যার পথ নিজেকে খুঁজে নিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো যেটা বলছিলাম বাতিস্তা ক্ষমতা দখলের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে এখনই রাজনীতিতে পুরোপুরি সক্রিয় হতে হবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আমি কিছুটা আইন পেশা শুরু করেছিলাম কিন্তু বুঝলাম সেসবের পাততাড়ি গুটাতে হবে এখন। আমাকে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়তে হবে এখনই। আমি জানতাম কিউবার প্রচলিত কোনো পার্টির কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমার মিলবে না। আমাকে নতুন পথ বের করতে হবে। আমার চিন্তার সঙ্গে মেলে তেমন গোটা ১০জন মিলে আমি একটা ছোট্ট রাজনৈতিক সেল তৈরি করি। সেখানে কিউবার পিপলস পার্টির আমার ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ ছিলেন, ছিল আমার ছোট ভাই রাউল ক্যাস্ট্রো। রাউল পপুলার সোসালিস্ট পার্টি নামে একটা ছাত্রসংগঠনের নেতা ছিল। বলতে পার স্রেফ সেই ১০ জন মানুষকে নিয়ে আমি শুরু করি আমার নতুন রাজনীতি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সঠিক কর্মসূচি নিয়ে আমরা যদি জনগণের কাছে যেতে পারি জনগণ মুহূর্তের ভেতর চলে আসবে আমাদের সাথে কারণ জনগণ মুখিয়ে আছে পরিবর্তনের জন্য।

আমরা আমাদের দলটির একটি নতুন নাম দিই। দলটির নাম হয় শুধু 'মুভমেন্ট', হ্যাঁ, 'আন্দোলন' আর কিছু না। আমরা আমাদের দলের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করি বাতিস্তাকে উৎখাত করা। আমরা খুব ভালো বুঝতে পারি যে কোনো প্রচলিত ভোটের রাজনীতি দিয়ে বাতিস্তাকে উৎখাত করা যাবে না। আমরা বুঝতে পারি বাতিস্তাকে উৎখাতের একমাত্র পথ একটা সশস্ত্র বিপ্লব। আমরা তেমন একটা সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই কর্মসূচি তৈরি করতে থাকি। আমাদের তখন মূল দুটো কাজ। এক, দলের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহ করা আর দুই বিপ্লবের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা। আমরা গোপনে খুব তোড়জোড়ে সদস্য সংগ্রহে নেমে পড়ি। আমার একটা পরিচিতি ইতোমধ্যে রাজনীতিতে তৈরি হয়েছিল। ফলে দ্রুত আমাদের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমরা বিভিন্ন এলাকায় এভাবে ১০ সদস্যের এক একটা ছোট ইউনিট করতে থাকি। বছর না ঘুরতেই আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড় হাজার। এরা সমাজের নানা স্তর থেকে আসা লড়াকু সব মানুষ। তবে অধিকাংশই হাভানার দরিদ্র অঞ্চলের মানুষ। আমরা টের পাই যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বাতিস্তাকে উৎখাত করা যাবে না। ছাত্রাবস্থায় ডোমিনিকান এবং কলাম্বিয়ার ছাত্রদের সঙ্গে মিলে সশস্ত্র সংগ্রামের কিছু অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমরা কিউবায় একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। আমরা একটা গোপন রেডিও স্টেশন স্থাপন করি এবং একটা সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করি। এর মধ্যে নানা সূত্র থেকে আমরা বেশ কিছু অস্ত্রও সংগ্রহ করি। আমরা টের পাই বড় অপারেশনে যাবার জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রচুর অস্ত্র। একপর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমরা একটা ক্যান্টনমেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করব। এক্ষেত্রেও আমরা হোসে মার্তি এবং সেই সময়ের বিপ্লবীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। তারাও সফলভাবে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা ভালো জানতাম যে সেই উনবিংশ শতাব্দীর সেনাবাহিনীর চাইতে বাতিস্তার সেনাবাহিনী ছিল অনেক বেশি চৌকস, আধুনিক; ফলে এধরনের ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ তখন ছিল ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। তবু আমরা সেই ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিই।

যুবক : এ সময়ই কি আপনারা সেই বিখ্যাত মনকাডা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন ?

ক্যাস্ট্রো : ঠিক তাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম মনকাডা ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে দ্রুত আমাদের শক্তিকে সংগঠিত করব। আমি, রাউল, আবেল, কামিলোসহ আরও বিপ্লবী সহকর্মী মিলে মনকাডা আক্রমণের খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করতে থাকি। এরপর কিউবার নানা প্রান্তে আমাদের দলের যে হাজার দেড়েক নতুন সদস্য সংগ্রহ হয়েছিল আমি তাদের প্রত্যেকের সাথে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করি, আলোচনা করি। তুমি এখন শুনলে হয়তো অবাক হবে যে সেসময় মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে আমি কিউবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত প্রায় ৪০ হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলাম। আমাদের দলে নতুন সদস্য দেশপ্রেমিক সেইসব তরুণদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মত বিনিময় করেছি আমি।

সেসময় কিউবাতে বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, নেতা ছিলেন কিন্তু তারা সবই ছিলেন ভণ্ড, সুযোগসন্ধানী। তারচেয়ে বরং দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সৎ, সাহসী, ঐ তরুণদের সাথে কথা বলে আমার মনে হতো তারা স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে। দেশের জন্য যেকোনো কিছু করতে তারা তখন প্রস্তুত। এদের ভেতর থেকেই নির্বাচিত কয়জনকে নিয়ে আমরা সান্তিয়াগো ডু কিউবার সবচেয়ে বড় ক্যান্টনমেন্ট মনকাডা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের মতো ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে নেমে পড়ি।

যুবক : আপনারা কতজন ছিলেন সেই অপারেশনে ?

ক্যাস্ট্রো : মাত্র ১২০ জন। বাতিস্তার বিশাল সেনাবাহিনীর কাছে এ এক হাস্যকর সংখ্যা । কিন্তু কি জান বুকের ভেতর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে অসীম সাহসিকতায় যদি কেউ যুদ্ধে নেমে পড়ে তাহলে তাদের কাছে ঐ বেতনভোগী সৈন্যরা কোন শক্তিই নয়। ইতিহাসে এমন অগণিত প্রমাণ আছে। ঐ ১২০জনকে আমি নিজে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মনকাডা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করব ২৬ জুলাই রাতে। সেটা ১৯৫৩ সাল। সেদিন আমরা সবাই প্রথম ইউনিফর্ম পরে নিই। আজ যে যুদ্ধের পোশাক আমার গায়ে দেখছ সেইদিনই হয়েছিল এই পোশাকের অভিষেক। সেদিন আমাদের কাছে বেশ কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটোমেটিক, সেমি অটোমেটিক অস্ত্র ছিল, ছিল কিছু ভারী সেল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ঘুমন্ত সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে দ্রুত তাদের অস্ত্রগুলো দখল করে সরে পড়ব। ২৬ জুলাই তারিখটা নির্বাচনের কারণ হচ্ছে সেটা ছিল আমাদের একটা স্থানীয় ফ্যাস্টিভেলের সময় আর ঐ দিনটি ছিল রোববার ছুটির দিন। সব মিলিয়ে ঐ দিনটিকে ক্যান্টনমেন্ট খানিকটা ঢিলে ঢালা মেজাজে থাকে। ৮০ জনের একটা দল মূল আক্রমণের দায়িত্ব নেয় আর বাকিরা কাভার দেওয়ার জন্য থাকে পেছনে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি একটি জায়গায়। মূল আক্রমণ দলের কমান্ডার হিসেবে মাঝরাতের পর জিপ নিয়ে আমি রওয়ানা দিই ক্যান্টনমেন্টের দিকে। আমার সামনে আমার দলেরই আরেকটা জিপ।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সবার ভেতর প্রবল উত্তেজনা। এসময়ই ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা। আমার সামনের জিপটি পথ ভুল করে ফেলে। আর তারা যে পথে যায় সেপথে অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হয়ে পড়ে টহল সেনার। এসময় কোন টহল সেনা থাকবার কথা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমাদের সামনের জিপের বন্ধুদের সঙ্গে মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় টহল সৈন্যদের বন্ধুক যুদ্ধ। সাথে সাথে জেগে ওঠে পুরো ক্যান্টনমেন্ট। এদিকে অপারেশন শুরু হয়ে গেছে ভেবে আমাদের পেছনে কাভার দেবার জন্য যে দল ছিল তারাও ফায়ার ওপেন করে। কেউ কেউ পাশে ক্যান্টমেন্টের হাসপাতাল ভবনকে ক্যান্টনমেন্টের মূল ভবন ভেবে সেখানে গুলি করে। এতে সেখানে ভর্তি কিছু রোগী, ডাক্তার মারা যায়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈন্যরা তখন তাদের পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর। সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। বুঝতে পারি আমাদের পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমি বুঝতে পারি আমাদের পিছু হটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আমি জিপ নিয়ে পিছু হঠি। কিন্তু এই তুমুল গোলাগুলির ভেতর দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমি কোনোরকমে হাসপাতালের কাছে থাকা দলটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই এবং তাদের পিছু হটার পরামর্শ দেই। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে কাছের সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিই। কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে যায়। ঐ রাতের যুদ্ধেই মারা যায় আমাদের ২০ জন বন্ধু। তারপর সেনাবাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেললে ধরা পড়ে আরও অনেকজন। যাদেরই তারা ধরতে পেরেছে তাদেরই সাথে সাথে গুলি কর হত্যা করেছে তারা। ১২০ জনের মধ্যে আমরা মাত্র ১৯ জন সেদিন পালিয়ে সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় পৌছাতে পেরেছিলাম। বাকিদের অনেকে মারা গিয়েছিল, অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল, অনেকে ইউনিফর্ম খুলে দলত্যাগ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘটনার পরদিনই বাতিস্তা মার্শাল ল জারি করে। বাতিস্তা প্রচার করে যে আমরা দুষ্কৃতিকারী এবং আমরা হাসপাতালের রোগীদের পর্যন্ত হত্যা করেছি। আগেই বলেছি ক্যান্টনমেন্টের বিল্ডিং ভেবে আমাদের কিছু বন্ধু ভুল করে হাসপাতালে গুলি করেছিল। বাতিস্তার সরকারের সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্যদের মনে এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তারা হন্যে হয়ে বিপ্লবীদের খুঁজতে থাকে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেকে ধরা পড়ে। যারা ধরা পড়ে সৈন্যরা তাদের বিনা বিচারে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমাদের দলের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ে। অনেকে দলত্যাগ করে। আমরা সেই ১৯ জন শুধু সিয়েরা মিয়েস্ত্রার পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকি। আমাদের প্রথম অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা এভাবে পুরোটা মাটি হয়ে গেলেও আমরা মনোবল হারাই না। সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে আত্মগোপন অবস্থাতেই আবার নতুন করে নিজেদের সংগঠিত করবার কথা ভাবতে থাকি। কিন্তু আমাদের জন্য আরও মারাত্মক সব ঘটনা অপেক্ষা করছিল।

যুবক : কোন ঘটনার কথা বলছেন ?

ক্যাস্ট্রো : আগেই বলেছি আমার জীবন তো নাটকীয় ঘটনায় ভরপুর। তেমনি আরেকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে এই পর্বে। তোমাকে এইমাত্র বললাম যে আমরা ১৯ জন কমরেড মনকাডা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পাহাড়ের চারপাশে ছিল দরিদ্র আখচাষিদের গ্রাম। তারা আমাদের পক্ষে ছিল এবং আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে সহায়তা করেছিল, খাবার সরবরাহ করেছিল। আমাদের ঐ মনকাডা আক্রমণের ঘটনা সারা কিউবা জুড়ে তোলে বিশাল তোলপাড়। বাতিস্তা সরকার এবং সেনাবাহিনী আমাদের নামে নানা অপ্রচার চালালেও এবং আমাদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিলেও সাধারণ মানুষ দাঁড়ায় আমাদের পক্ষে। আমাদের দলের যে সদস্যরা ধরা পড়েছিল তাদের নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদ করে সাধারণ মানুষ।

ইতোমধ্যে এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে আমার নামটাও ছড়িয়ে পড়ে সারা কিউবায়। কিন্তু আমি তখন আত্মগোপন করে আছি সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে। সে খবর কেউ জানে না। আমরা যে ১৯ জন পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলাম তার মধ্যে কয়েকজন আক্রমণের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়েছিল। আমরা পাহাড়ে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছিলাম কিন্তু তাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। একপর্যায়ে তাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রকাশ্যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছিল অসম্ভব। আমরা তখন সান্টিয়াগো ডু কিউবার আর্চ বিশপের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আর্চ বিশপ তখন কিউবায় অত্যন্ত ক্ষমতাধর একজন মানুষ। বাতিস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার যেভাবে আমাদের বিদ্রোহীদের ধরে হত্যা করছিল তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। আমরা তাই ঠিক করলাম গোপনে আর্চ বিশপের সাথে যোগাযোগ করে তাকে আমাদের কমরেডদের চিকিৎসার ব্যাপারে অনুরোধ করব। আমরা তার সঙ্গে গোপনে ফোনে কথা বলি। তিনি আমাদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। বলেন আমরা যদি আমাদের সেই আহত বন্ধুদের তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে তিনি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। আমরা ঠিক করি আমাদের সেই আহত কমরেডদের আমরা শহরের কাছে একটি বাড়িতে রেখে আসব তারপর আর্চ বিশপ এসে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সেই কথা অনুযায়ী অনেক রাতে আমরা ৭/৮ জন কমরেড আহত বন্ধুদের নিয়ে রওয়ানা দিই সেই নির্ধারিত বাড়িটির দিকে। সেই বাড়িটির কাছে আসার মাইল দুয়ের আগে আমি এবং আরও দু'জন আমাদের অন্য কমরেডদের কাছে থেকে বিদায় নিই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল কিছু কমরেড সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে থাকবে আর আমরা তিনজন সান্টিয়াগো ডু কিউবার উপকূল অঞ্চলে গিয়ে সেখান থেকে আমাদের দলের অন্যান্য সদস্যদের আবার সংগঠিত করব। উপকূলের দিকে যাবার জন্য আমাদের দুর্গম পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা সারারাত হেঁটে সেই পাহাড়টা পাড়ি দেব ঠিক করলাম। আমরা রাতভর পাহাড়ি পথ পাড়ি দিলাম। ভোর রাতের দিকে পাহাড়ের ভেতর আমরা একটা জরাজীর্ণ কুড়েঘর দেখতে পেলাম। দীর্ঘপথ হেঁটে আমরা তিনজন খুবই ক্লান্ত ছিলাম। কুড়েঘরটা দেখে ভাবলাম এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই। ভেতরে গিয়ে দেখলাম একটা পরিত্যক্ত ছোট্ট ঘর। ঘরে কোনো আসবাব নেই। আমরা তিনজনই খালি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। বাইরে তখন খুব ঠান্ডা আর ভারী কুয়াশা। আমরা ভোরের আলো ফুটবার আগ পর্যন্ত সেখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মেঝেতে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল বুটের লাথিতে। চোখ খুলে দেখি শায়িত আমাদের তিনজনের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো সৈন্য। আমরা ধরা পরে গেলাম সৈন্যদের হাতে। পরে জানতে পেরেছি আমরা যে আর্চ বিশপের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম সেটা আড়ি পেতে শুনেছিল সেনাবাহিনী। তারপর তারা চারদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল টহল সৈনিক। এভাবেই ধরা পড়ে গেলাম আমরা। বুঝতেই পাচ্ছ কী ভয়ংকর পরিস্থিতির ভেতরে পড়েছিলাম আমরা।

যুবক : শুনতে শুনতে আমারই তো গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। তারপর কি হলো?

ক্যাস্ট্রো : আমাদের পেয়ে কয়েকজন সৈন্য ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল এবং আমাদের তৎক্ষণাৎ গুলি করবার জন্য প্রস্তুত হলো। আমাদের তিনজনকে দাঁড় করিয়ে আমাদের হাতগুলো দড়ি দিয়ে পেছনে বাঁধা হলো। আমাদের লাইন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড় করাল তারা। একজন সৈন্য আমাদের খুনি বলে গালাগাল করতে লাগল। আমি রেগে গিয়ে তাকে বললাম, যা ইচ্ছা করো কিন্তু আমাদের খুনি বলবে না। আমরা খুনি নই, বিপ্লবী। আমি জানতাম আমাদের বাঁচবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, ফলে আমি তাদের সঙ্গে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করল। আমরা আমাদের নাম বানিয়ে বানিয়ে বললাম।

যুবক : তখন আপনার নাম কি সবার কাছে পরিচিত ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমার নামটা মোটামুটি তখন চারদিকে প্রচার হয়ে গেছে কিন্তু আমার চেহারা তখনও পরিচিত নয়। ফলে সৈন্যরা আমাকে চিনতে পারেনি। আমি যদি আমার আসল নাম তখন বলতাম তাহলে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আমাদের গুলি করত ওরা। আমাদের দাঁড় করিয়ে সৈন্যরা অপেক্ষা করছিল আমাদের গুলি করার জন্য তাদের কমান্ডারের আদেশের। আমি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে চিৎকার করে বলছিলাম, 'আমাদের তোমরা হত্যা করতে পার কিন্তু তোমরা আমাদের বিশ্বাসকে, আদর্শকে, বিপ্লবকে হত্যা করতে পারবে না। আমরা ফিরে ফিরে আসব। তোমরা তো হুকুমের গোলাম, একবার শুধু নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখ কার স্বার্থে তোমরা আমাদের হত্যা করছ।'

আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। সৈন্যরা আমাদের মাটিতে বসতে বলে। আমি বলি, গুলি করতে হলে দাঁড়ানো অবস্থাতেই কর, আমরা মাটিতে বসব না। ১০/১২ জন সৈন্য ছিল। তারা এবার আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়ায়। আমি মৃত্যুর প্রহর গুনছি। এসময় একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। সেই সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ লেফটেন্যান্ট। তিনি হঠাৎ সৈন্যদের বললেন, 'বন্দুক নামাও। গুলি করো না। এভাবে গুলি করে তো আর আদর্শকে হত্যা করা যায় না।' সৈন্যরা ইতস্তত করতে লাগল। সেই লেফটেন্যান্ট আবার বললেন, 'বন্দুক নামাও'। সৈন্যরা বন্দুক নামিয়ে ফেলল। আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তিনি বললেন, 'তোমরা খুব সাহসী ছেলে, খুবই সাহসী। তোমাদের হত্যা করা হবে না। আমি তোমাদের বন্দী করলাম।'

তিনি আমাদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন হাইওয়েতে উঠবার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে আমি একসময় সেই লেফটেন্যান্টের খুব কাছে গিয়ে তার কানে কানে বললাম. 'আপনাকে ধন্যবাদ আর শুনুন আমিই হচ্ছি ফিদেল ক্যাস্ট্রো।' সেই লেফটেন্যান্ট চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার কানে কানে বললেন, 'আর কাউকে বলবে না, কিছুতেই বলবে না, এ নাম একবারও উচ্চারণ করবে না আর।' তিনি হাইওয়েতে এসে একটা ট্রাকে উঠলেন। আমাকে বসালেন সামনের সিটে তার পাশে। কিছুদূর যেতেই একটা সেনাবাহিনীর জিপ সেই ট্রাকটিকে থামাল এবং এক মেজর বলল আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই লেফটেন্যান্ট আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যেতে অস্বীকার করলেন, বললেন তিনি আমাদের জেলে নিয়ে যাবেন। সেই ল্যাফটেন্যান্ট জানতেন যে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলে আমাদের জীবিত ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি তাই যে করে হোক আমাদের বেসামরিক আদালতের কাছে তুলে দিতে চাচ্ছিলেন যাতে আমরা ন্যায় বিচার পাই। তিনি তারপর আমাদের সান্তিয়াগো ডু কিউবার কারাগারে নিয়ে জেলারের হাতে তুলে দেন। আমরা সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাই। সত্যি বলতে সেই লেফটেন্যান্ট যদি সেদিন আমাদের বাঁচিয়ে না তুলতেন তাহলে কিউবার ইতিহাস হতো অন্যরকম।

যুবক : সেই ল্যাফটেন্যান্ট সম্পর্কে জানতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে, তার সঙ্গে পরে কি আপনার দেখা হয়েছিল ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিউবার বিপ্লবে তিনিও তো এক মহান অংশীদার। তার নাম লেফটেন্যান্টে পেড্রো সারিয়া। আফ্রিকান বংশদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ কিউবান তিনি। তার পূর্বপুরুষ স্প্যানিশদের দাস হয়েই এসেছিলেন কিউবাতে। তিনি জীবিকার জন্য সেনাবাহিনীতে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তার পরিবারের ভেতরের বঞ্চনার ইতিহাস নিশ্চয়ই তার জানা ছিল। যে কারণে বিপ্লবীদের প্রতি একটা গোপন সহানুভূতি ছিল তার। আমাদের হত্যা না করার জন্য পরে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লব সফল হবার পর আমি খোঁজ করি সেই লেফটেন্যান্টের। তাকে সেনাবাহিনীতে পুনর্বহাল করি এবং প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রধান করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি বিপ্লবের কিছুকাল পরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং মারা যান। কিন্তু লেফন্যাটেন্ট পেড্রোকে আমি কিউবার ইতিহাসের একজন মহান কুশীলব হিসেবেই মনে করি। আমার এখনও কানে বাজে সেই জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, 'বন্দুক নামাও। গুলি কোরো না। এভাবে গুলি করে তো আর আদর্শকে হত্যা করা যায় না।' আমার মনে পড়ে আমার কানে কানে তিনি বলছেন, 'আর কাউকে বলবে না, কিছুতেই বলবে না, এ নাম একবারও উচ্চারণ করবে না।' আসলে কি জানো তুমি যদি আদর্শে স্থির থাক তাহলে এভাবে পথে পথে কত অপ্রত্যাশিত বন্ধু যে তুমি পেয়ে যাবে তার কোনো হিসেব নেই।

যুবক : আপনি বলছিলেন সেই লেফটেন্যান্ট আপনাদের জেলারের হাতে তুলে দিল, তারপর কী হলো ?

ক্যাস্ট্রো : আমাদের যে কমরেডরা আহত বন্ধুদের নিয়ে আর্চ বিশপের বাড়িতে যাচ্ছিল তারাও ধরা পড়ে এবং তাদেরও জেলে আনা হয়। তারপর তো শুরু হলো আমাদের নিয়ে সেই ঐতিহাসিক বিচার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : সেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তো আপনি একটা ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, সেই বিচারের সময় আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চার ঘণ্টার এক জবানবন্দি দিয়েছিলাম। আমাকে কোনো আইনজীবী দেওয়া হয়নি। আমি যেহেতু আইন পড়েছিলাম ফলে আমি নিজেই হয়েছিলাম আমার আইনজীবী। এখনও সেই জবানবন্দির অনেক অংশ মনে আছে আমার। বলেছিলাম, "মাননীয় আদালত, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো আইনজীবীকে এমন দুরূহ পরিস্থিতিতে তার পেশাগত কাজ করবার নজির নেই, নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও এমন সীমাহীন অনিয়মের। এ এক অভিনব বিচার যেখানে অভিযুক্ত এবং তার আইনজীবী একই মানুষ। আইনজীবী হিসেবে এমনকি অভিযুক্তের অভিযোগপত্রটি দেখবারও কোনো সুযোগ আমার হয়নি। আর অভিযুক্ত হিসেবে আমাকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ছিয়াত্তর দিন একাকী আটকে রাখা হয়েছে এক অন্ধকার কুঠুরিতে যা একজন মানুষের মানবিক এবং আইনি অধিকারের চরম অবমাননা।

মাননীয় আদালত, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে আপনার সঙ্গে কথা বলছে সে অহংকার, আত্মপ্রচার তার সবটুকু সত্তা দিয়ে ঘৃণা করে, আদালতে দাঁড়িয়ে কোনো ভাবাবেগ তৈরিতেও তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। তারপরও সে তার অত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছি দুটো কারণে, এক, তাকে বিন্দুমাত্র আইনি সহয়তা, যা একজন নাগরিকের ন্যূনতম অধিকার তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে এবং দুই, চেতনায় যে গভীর বেদনা আর ক্ষত নিয়ে সে তার মাতৃভূমির ভয়বাহ বিপর্যয় আর অনাচার দেখেছে তার পক্ষেই এইরকম একটি অভিনব পরিস্থিতিকে কথা বলা সম্ভব, যে কথা উৎসারিত হবে তার হৃদপিণ্ডের রক্তক্ষরণ থেকে, অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে।'

এরপর চারঘণ্টা ব্যাপী সেই জবানবন্দিতে আমি বর্ণনা করেছিলাম এই আদালতের অসারতার কথা। আমি কিউবার শত বছরের ইতিহাসের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম কেন আজ এই মুহূর্তে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী বাতিস্তার বিরুদ্ধে এমন একটি অভ্যুত্থান ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আমাদের এই অভ্যুত্থান যে নেহাত উত্তেজনা প্রসূত কোনো কর্মকাণ্ড নয় সেটি বোঝাবার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছিলাম বিপ্লব পরবর্তী আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কর্মসূচি। ঘৃণা জানিয়েছিলাম বিনা বিচারে আমার কমরেডদের নৃশংসভাবে হত্যার বিরুদ্ধে। বিচারকদের বলেছিলাম, যে মানুষ তার মাতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ করে, তার সব বেদনা মুছে যায়, ছিঁড়ে যায় তার সব শৃঙ্খল আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অবশেষে শুরু হয় তার নতুন জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালতকে বলেছিলাম আমি জানি আমার কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার চক্রান্ত হবে কিন্তু সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই। যে প্রাণের বেগ সূচিত হয়েছে কিউবার নানা প্রান্তে আমাকে স্তব্ধ করে সে বেগ থামানো যাবে না। আবৃত্তি করেছিলাম হোসে মার্তির কবিতা:

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেমন নেমে আসে পাথর
সত্যমত বাধা ঠেলে ঠেলে সে পৌঁছে যায় গন্তব্যে
কেউ হয়েতো কখনো শ্লথ করে দিতে পারে তার গতি
কিন্তু চিরতরে থামানো ?
অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম আদালত আমাকে যে অপরাধেই অপরাধী করুক না কেন ইতিহাস আমাকে একদিন মুক্তি দেবেই। আমার সেই জবানবন্দি পরে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' এই শিরোনামেই।

আমাদের যখন বিচার চলছে তখন বহু নাগরিক সংগঠন, সামাজিক সংস্থা, বিখ্যাত ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক আমাদের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। আমাদের হয়তো ফাঁসিই দেওয়া হতো কিন্তু সেদিকে জনরোষের কথা ভেবে আমাদের নানা মেয়াদের জেল দেওয়া হয়। আমার হয় ১৫ বছরের জেল। সান্তিয়াগো ডু কিউবার উপকূলের কাছে এক দ্বীপের জেলে নেওয়া হয় আমাদেরকে। প্রথম তিন মাস আমাকে রাখা হয়েছিল নির্জন এক কক্ষে। তারপর আমাকে পাঠানো হয় অন্যদের সাথে একই সেলে। আমাদের দলের গোটা ৫০ জনের শাস্তি হয়েছিল। শাস্তি হয়েছিল আমার ভাই রাউলেরও। আমি সেলে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার পর আবার জেলের ভেতর থেকেই দলটিকে সংগঠিত করবার পরিকল্পনা করি। আমি আমাদের দলের এবার এক নতুন নাম দিই। এবারে দলের নাম হয় 'মুভমেন্ট জুলাই ২৬'। আমাদের মনাকাডা আক্রমণের দিনটাকে স্মরণ করেই আমরা দলের নামের সাথে ২৬ শে জুলাই যুক্ত করি। পরবর্তীকালে আমাদের আন্দোলনের নাম হয় '২৬ জুলাই আন্দোলন'। আমাদের দলকে সংক্ষেপে তখন ডাকা হতো এম-২৬-৭। আমি জেলে বসে আমার জবানবন্দিটিকে লিখে ফেলি এবং গোপনে সেটা পাচার করি বাইরে এবং কমরেডদের বলি সেটা ছাপাতে।

'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' নামের সেই বইটি হয়ে ওঠে আমাদের নতুন রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টো। এই বইটি মানুষের ভেতর ব্যাপক সাড়া তোলে। অনেক তরুণ তরুণী আমাদের এই নতুন দলের সাথে যুক্ত হতে থাকে। আমরা জেলে বসেই জেলের বাইরে আমাদের কমরেডদের সাথে যোগাযোগ রাখি। জেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবার সময় আমার আরেকটা বিরাট লাভ হয়। জেলে আমি প্রচুর অবসর পাই আর সেই সময়টাকে কাজে লাগাই পড়াশোনায়। তোমাকে বলেছিলাম যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে পলিটিক্যাল ইকোনমির উপর উচ্চতর পড়াশোনা করবার জন্য স্কলারশিপ খুঁজছিলাম। এই জেল আমাকে বরং সেই পড়াশোনার সুযোগ এনে দেয়। এসময় আমি পলিটিক্যাল ইকোনমির বিস্তর বই সংগ্রহ করি এবং পড়ি। সেই সঙ্গে মার্কস, লেনিনের পুরো রচনাবলি গোগ্রাসে পড়ি। পড়ি আরও অগণিত দর্শনের আর সাহিত্যের বই। আমি তো সাহিত্যের পেটুক পাঠক।

যুবক : আমি জানি বিশ্বখ্যাত লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমি আর মার্কেজ তো বহুদিনের বন্ধু। কত আড্ডা যে তার সঙ্গে মেরেছি। তার প্রায় সব লেখাই কিন্তু একসময় ছাপাবার আগে আমাকে সে পড়তে পাঠাত মন্তব্যের জন্য। তার সেই বিখ্যাত 'হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচুড'ও পাঠিয়েছিল। মার্কেজ যখন নোবেল পুরস্কার পেল আমি তাকে জাহাজ ভরে কিউবান ওয়াইন পাঠিয়েছিলাম উপহার হিসেবে। আর তার জন্য কিউবাতে একটা বাড়িও বরাদ্দ আছে। সে যখন ইচ্ছা এসে সেখানে থাকতে পারে। এখন আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে কিন্তু একসময় মার্কেজ সুযোগ পেলেই ছুটে আসত কিউবায় আর আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতাম।

তো জেলে বসে রাজনীতির বইয়ের পাশাপাশি প্রচুর সাহিত্য পড়েছি। দস্তয়ভস্কি, টলস্টয় থেকে শুরু করে কাজান্তসেস, পড়েছি প্রিয় কবি নেরুদার কবিতা। পড়াশোনা করলে জেলে ওরা কিছু বলত না, আমরা বাইরে থেকেও বই আনাতে পারতাম। ফলে কারাবাসের ঐ সময়টাতে আমি সত্যিই আবার ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম। পড়ার এই অভ্যাস কিন্তু আমি সারাজীবনই ধরে রেখেছি। পরে আমি যখন গেরিলা যুদ্ধ করেছি তখনও ফাঁক পেলে জঙ্গলে বসে গেছি বই নিয়ে। এখনও আমার গাড়িতে একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি আছে। আমি যেখানে চলি সেই লাইব্রেরি চলে আমার সঙ্গে। কত বই যে পড়বার সাধ জাগে। কিন্তু এই একজীবনে কতটুকুই বা পড়ে শেষ করা যাবে। তবু আমি অবিরাম পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। তো আমার জেল জীবনের কথা বলছিলাম। জেলে বসেই আমি আমার অন্য বন্দী কমরেডদের নিয়ে আমাদের বিপ্লবের পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করেছিলাম। এমনকি বিপ্লব সফল হলে আমারদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলো কী হবে সেটার রূপরেখাও তৈরি করেছিলাম। সবদিক থেকেই আমার ঐ কারাবাস ছিল খুব কাজের। তবে এই জেলে যাবার ফলে আমাকে হারাতেও হলো অনেক কিছু। আমার স্ত্রী মিত্রা আমাদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তখন খুব বিপদে ছিল। আমার এই বিপ্লবী জীবনের সঙ্গে সে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্ম বোধ করেনি। আমাদের আদর্শগত অমিলও দেখা দেয়। আমি তখন ১৫ বছরের জন্য জেলে বন্দী। সুতরাং আমাদের দাম্পত্য জীবন এগিয়ে নিয়ে যাবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমরা পরস্পর আলাপের মাধ্যমে ডিভোর্স নিয়ে নিই। আমি জেলে বসেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা সারি। আমাদের ছয় বছরের বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে। মিত্রা আমাদের ছেলেটিক নিয়ে পৃথক হয়ে যায়।

এর মধ্যে একদিন ঘটে আরেক ঘটনা। যে দ্বীপে আমাদের কারাগার সেখানে একদিন বাতিস্তা আসে একটা পাওয়ার প্লান্ট উদ্বোধন করতে। পাওয়ার প্লান্টটা ছিল জেলের বেশ কাছেই। আমাদের এক কমরেড সেলের ছোট জানালা দিয়ে দেখতে পায় বাতিস্তা পাওয়ার প্লান্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। তখন সবাই মিলে আমরা কোরাসে গাইতে শুরু করি আমাদের ২৬ জুলাই সংগীত। এটা ছিল আসলে একটা স্বৈরাচার বিরোধী গান যেটা আমরা আমাদের পার্টি সংগীত করে নিয়েছিলাম।আমরা যখন সবাই মিলে কোরাসে গাইছি তখন সে গানের আওয়াজ জেলের দেওয়াল ভেদ করে পৌঁছে যাচ্ছিল বাইরে। বাতিস্তা ভেবেছিল হয়তো তার প্রশংসা করে কোনো গান গাওয়া হচ্ছে। আমরা সেলে উঁচুতে থাকা জানালা দিয়ে দেখলাম বাতিস্তা গানটা ভালো মতো শুনবার জন্য সবাইকে চুপ হতে বলছে। আমরা তখন আরও গলা চড়িয়ে গাইতে লাগলাম, 'ওরে বুভুক্ষ স্বৈরাচারী, তোকে আমরা ছুড়ে দেব কাদায়'।

বাতিস্তার মুখ ম্লান হয়ে যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠায় জেলের ভেতর। সৈন্যরা এসে আমাদের সবাইকে ধরে বিভিন্ন সেলে পৃথক করে দেয়। এরপর আবার তারা আমাকে নিয়ে যায় নির্জন এক সেলে। সেই থেকে আমি আবার একা একটা সেলে থাকতে লাগলাম। এদিকে আমাদের কারাদণ্ডের ব্যাপারে এবং আমাদের দলীয় সদস্যদের বর্বরভাবে দমনের বিরুদ্ধে জনগণের ভেতর অসন্তোষ বাড়তেই থাকে। বাতিস্তার সামরিক সরকার জনজীবনেও চালাতে থাকে নানা দমন, নিপীড়ন। ফলে জনগণের ভেতর বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। বিক্ষোভের একটা প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কারামুক্তি। এসময় বাতিস্তা নির্বাচন ঘোষণা করে এবং সে নিজে প্রার্থী হয়। নানা দমন নিপীড়নে বিরোধী দল বলে তেমন আর কিছু ছিল না তখন কিউবায়। আসলে বাতিস্তা একটা নামকা ওয়াস্তে নির্বাচন দিয়ে নিজের ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দিতে চাচ্ছিল। জনগণের প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। এসময় সাধারণ মানুষের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের একটা বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল আমাদের অন্যায় বিচার। আমরাও জেলের ভেতর থেকে প্রচার কাজ চালাচ্ছিলাম, যোগাযোগ রাখছিলাম আমাদের দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাতিস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে এবং আমাদের দলের অন্যান্যদের নির্বাচনের আগে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিউবাতে রেওয়াজ আছে নির্বাচনের আগে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার।

যুবক : আপনাদের এভাবে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তে আপনারা কি অবাক হয়েছিলেন ?

ক্যাস্ট্রো : কিছুটা অবাক হয়েছিলাম কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিতও ছিল না। আসলে আমাদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো শর্ত কাজ করেছিল। একদিকে জনগণের দাবি, অন্যদিকে বাতিস্তারও ইচ্ছা ছিল নিজের সরকারের একটা মহানুভব, গণতান্ত্রিক চেহারা দাঁড় করানো। আমাদের মুক্তি দিলে জনগণের ভেতর তার একটা ইতিবাচক ইমেজ হবে এমন একটা ধারণা হয়েছিল তার। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করার, বাকিদের জেলে নেবার পর বাতিস্তা ভেবেছিল শক্তি, সম্পদ হারিয়ে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমাদের আর উঠে দাঁড়াবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এছাড়া ইতোমধ্যে আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পেয়েছে বাতিস্তা। সে ভেবেছিল আমাদের মতো এই চুনোপুঁটিদের মুক্তি দিয়ে তার তেমন কোনো ঝুঁকিই নেই বরং এর বিনিময়ে সে একটা কৃতিত্বের অধিকারী হবে। সত্যি বলতে আমাদের খাটো করে দেখেছিল সে। ২২ মাস জেল খাটবার পর মুক্ত হয়েছিলাম আমি।

যুবক : জেল থেকে বেরিয়েই কি আপনি আবার নতুন উদ্যমে নেমে পড়লেন আন্দোলনে ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ। আমার হাতে তো তখন অনেক কাজ, অনেক পরিকল্পনা। সময় নষ্ট করবার অবকাশ আমার ছিল না। কিন্তু আমাকে মুক্তি দিলেও আমার উপর কড়া নজর ছিল বাতিস্তা সরকারের। আমি আর রাউল তখন ঠিক করলাম চলে যাব ম্যাক্সিকোতে। সেখান থেকে আরও সংগঠিত হয়ে আরও সুচারু পরিকল্পনা করে আঘাত হানব বাতিস্তা সরকারের উপর। আমরা জানতাম এক গেরিলা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বাতিস্তাকে উৎখাত করা যাবে না। আমরা ম্যাক্সিকোতে গিয়ে একটা দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী তৈরি করবার পরিকল্পনা করলাম। আমরা ম্যাক্সিকো পৌঁছাবার পর আমাদের সঙ্গে কিউবা থেকে এসে একে একে যোগ দেয় আরও অনেক যুবক। কিউবাতেও আমাদের জুলাই ২৬ দলের সদস্যরা সংগঠিত হতে থাকে। আমাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হন স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের বিখ্যাত জেনারেল আলবার্তো বায়ো, যিনি তখন ম্যাক্সিকোতে প্রবাসী জীবন যাপন করছেন। এসময়ই আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে আশ্চর্য সেই মানুষ চে গুয়েভারা সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : চে গুয়েভারা তো এখন এক কিংবদন্তি মানুষ। লক্ষ কোটি তরুণের অনুপ্রেরণার মানুষ। তার সঙ্গে পরিচয়ের গল্পটা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই।

ক্যাস্ট্রো : আসলে চে'র সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমার ভাই রাউলের। সে একদিন আমাকে এসে বলল আর্জেন্টিনার এক ডাক্তার আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়। আমি পরিচিত হতে চাইলাম। গুয়েভারা আমার চেয়ে বছর দু'য়েকের ছোট। আর্জেন্টিনায় সবাই কিন্তু তাদের নামের আগে বলে চে। ইংরেজি মিস্টারের মতো। সেই হিসেবে ওর নাম চে গুয়েভারা। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে চে বলতে সারা পৃথিবীর মানুষ গুয়েভারাকেই বোঝে। চে'র সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হলো তার কিছুকাল আগে সে আর্জেন্টিনা থেকে ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছে। তারপর তার এক বন্ধুকে নিয়ে মোটর সাইকেলে সারা ল্যাটিন আমেরিকা চষে বেরিয়েছে, ঘুরেছে আমাজনের গভীর জঙ্গলে। দুর্দান্ত সব অ্যাডভেঞ্চার করেছে সে। কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে, কথা বলে আমি লক্ষ করলাম চে নেহাত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এক তরুণ মাত্র নয়। অত্যন্ত মেধাবী, প্রজ্ঞাবান একজন যুবক সে। মজার ব্যাপার কি জান তার সাথে প্রথম আলাপ করেই আমার এত ভালো লেগেছিল যে সেই প্রথম দিনই আমরা সারারাত লাগাতার গল্প করেছি। গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখেছি কখন ভোর হয়ে গেছে। গল্প বলতে আমরা কথা বলেছি রাজনীতি নিয়ে, ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কথা বলতে বলতে আমরা লক্ষ করেছি আমাদের চিন্তার ভেতর আশ্চর্য মিল। চে ডাক্তারি পড়লেও সে ছিল বিপ্লবী। মার্কসবাদের উপর ছিল তার অগাধ পড়াশোনা। বিপ্লব নিয়ে, সমাজ পরিবর্তন নিয়ে তার ছিল স্বচ্ছ ভাবনা, ছিল নিজস্ব কিছু ধারণা। তাত্ত্বিকভাবে সে ছিল অনেক অগ্রসর। কোন কিছুকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার তার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব সংগঠিত করাই সে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। ম্যাক্সিকোতে আসার আগে সে ছিল গুয়েতেমালাতে। সেখানে আমেরিকার সিইআএ'র সহায়তায় যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল চে।

চে আমাদের কিউবার বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিতে চাইলে আমি সাদরে তাকে গ্রহণ করি। সে প্রথমে আমাদের দলে একজন ডাক্তার হিসেবেই যোগ দেয়। কিন্তু পাশাপাশি সে থাকে আমাদের গেরিলা দলেরও সক্রিয় সদস্য। গেরিলা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমি ম্যাক্সিকো এবং আমেরিকায় থাকা প্রবাসী কিউবানদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। তারা আমাকে নৈতিক সমর্থন দিয়ে, আর্থিক অনুদান দিয়ে বিপুলভাবে সাহায্য করে। আমি এসময় আমেরিকার অনেক শহর ঘুরেছি। আমরা তখন নানা সূত্র থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। প্রবাসীদের দেওয়া অর্থে একটা বড় তহবিল গঠন করি। ওদিকে কিউবার মূল ভূখণ্ডেও আমাদের কমরেডরা সংগঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করি। আমরা খুব সতর্কতার সাথে, গোপনীয়তার সাথে অগ্রসর হতে থাকি। সব প্রস্তুতির পর পরিকল্পনা করি আমরা একটা সশস্ত্র দল ম্যাক্সিকো থেকে যাব সান্তিয়াগো ডু কিউবাতে এবং সেখানে অপেক্ষা করতে থাকা আমাদের আরেকটি সশস্ত্র দল যারা কিউবার অভ্যন্তরে নিজেদের প্রস্তুত করেছে তাদের সঙ্গে মিলিত হব। তারপর আমরা যৌথ অভিযান চালিয়ে সান্তিয়াগো ডু কিউবার প্রধান স্থাপনাগুলো দখল করব এবং রেডিও, টিভিতে জনগণের কাছে আহবান জানাব আমাদের বিপ্লবে যোগ দিতে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাতিস্তার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর রাতে আমরা 'গ্রানমা' নামে একটা ছোট জাহাজে চড়ে ৮২ জন সশস্ত্র যোদ্ধা ম্যাক্সিকোর উপকূল থেকে রওয়না দেই কিউবার উপকূলের দিকে।

যুবক : এই গ্রানমা জাহাজটিই তো আমি দেখেছি হাভানার মিউজিয়ামে।

ক্যাস্ট্রো : ঐ জাহাজটার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ওটাকে একটা প্রতীক হিসেবে আমরা রেখেছি নতুন প্রজন্মের জন্য। কিউবার জাতীয় দৈনিক পত্রিকাটির নামও কিন্তু এখন 'গ্রানমা'।

যুবক : কিন্তু আপনারা মাত্র ৮২ জন মিলে রওয়ানা দিলেন একটা বিপ্লব ঘটাতে ?

ক্যাস্ট্রো : সত্যি বলতে কি পৃথিবীকে বদলে ফেলতে, ইতিহাসকে বদলে ফেলতে খুব বেশি মানুষ প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন অল্প কয়জন খাঁটি মানুষ। তার প্রমাণ ইতিহাসে অনেক আছে। আমরাও তার প্রমাণ রেখেছি। একবারে হয়তো পারিনি কিন্তু দৃঢ় মনবলে রেখে অল্প কয়জন মানুষই কিন্তু আমরা বদলে ফেলেছিলাম কিউবার ইতিহাস। আর ইতিহাস বদলে দেওয়ার ঘটনায় ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা তো থাকবেই। ১৯৫৬-এর ২৫ শে নভেম্বর রাত দু'টায় আমরা ৮২ জন ম্যাক্সিকো থেকে রওয়ানা দিয়েছিলাম কিউবার উদ্দেশে। নিয়ম মতো পাঁচদিন সমুদ্রভ্রমণ শেষে আমাদের কিউবার উপকূলে পৌছানোর কথা ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা কিউবার অভ্যন্তরীণ দলটির। কিন্তু বিপ্লবের পথ তো মসৃণ নয়। এর পদে পদে বিপদ, অনিশ্চয়তা, দুর্ঘটনা। দুদিন যাত্রার পর সমুদ্র অস্বাভাবিক উত্তাল হয়ে ওঠে। তৃতীয় দিন সারাটা দিন ধরে জাহাজ কেবলই উথাল পাথাল করতে থাকে। জাহাজের যাত্রীদের হয় মরণ দশা। সবাই বমি করে একাকার, মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে থাকে সবাই। ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে অধিকাংশ কমরেড। জাহাজ এগোয় না। আমাদের যাত্রা পিছিয়ে যায়। আমাদের রসদ সব ফুরিয়ে আসতে থাকে এক এক করে। শেষে সাত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের দিন বাধ্য হয়ে কাছাকাছি অনির্ধারিত একটি উপকূলে আমাদের নামতে হয়। ওদিকে আমাদের আগের হিসাব অনুযায়ী কিউবার কমরেডরা সান্তিয়াগো ডু কিউবায় শুরু করে দেয় অভ্যুত্থান। তারা ভাবে আমরা অচিরেই যোগ দেব তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমরা তখন এক অচেনা উপকূলের জলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে কোনরকমে ডাঙায় উঠবার চেষ্টা করছি। তখন তো আর মোবাইলের যুগ নয় যে পরস্পর যোগাযোগ করতে পারব। আমরা যে উপকূলে নামলাম একপর্যায়ে সেখানকার কোস্ট গার্ড আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায় এবং সেনাবাহিনীকে খবর দেয়। আমরা বুঝতে পারি সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে আবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলে আমাদের। শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। আমরা কোনরকম এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাবার পথ খুঁজি। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে চে, রাউল, আবেল, কামিলো। আমরা আবার উপকূলের পাশেই একটা পাহাড়ে আশ্রয় নিই। গোলাগুলিতে দলের বহুজন নিহত হয়। সেই এলাকা থেকে সিয়েরা মিয়েস্ত্রা, যা ছিল আমাদের প্রথম ঘাঁটি তা খুব দূরে নয়। সেই ৮২ জনের ভেতর মাত্র ২২ জন আমরা শেষে সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে পৌঁছাতে সক্ষম হই। বাকিরা কেউ মারা যায়, কেউ পালিয়ে যায়, ধরা পড়ে অনেকে।

যুবক : আপনাদের বিপ্লবের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও তাহলে এভাবে নেমে এল মারাত্মক বিপর্যয় ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ। একটা সমাজ ভেঙে আরেকটা নতুন সমজা গড়া ভীষণ কঠিন কাজ। তার পদে পদে কত বিপদ, ঝুঁকি। কিন্তু আমরা মনোবল হারাইনি। আবার নতুন উদ্যমে সংগঠিত করেছি নিজেদের। মার্তির সেই কবিতাটির কথা স্মরণ কর। যে পাথর একবার পাহাড় থেকে নেমেছে সে তার গন্তব্যে পৌঁছাবেই। কোথাও সে বাধাপ্রাপ্ত হবে, কোথাও তার গতি শ্লথ হবে কিন্তু যেখানে যাবার সেখানে সে যাবেই। আমরা সবাই ছিলাম তেমনি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর। আমাদের এই ব্যর্থতা আমাদের আরও জেদি করে তোলে, করে তোলে আরও অত্মপ্রত্যয়ী। ইতোমধ্যে আমরা আগের চেয়ে অভিজ্ঞ, রসদ, অস্ত্র, অর্থে আমরা আগের চেয়ে বেশি সজ্জিত। আমরা সিদ্ধান্ত নিই সিয়েরা মিয়েস্ত্রার পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে পুরো এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেব আমরা এবং এখান থেকেই নেতৃত্ব দেব দেশব্যাপী বিপ্লবের।

সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় আমাদের আগেই ঘাঁটি ছিল, পুরো এলাকার মানুষ ছিল আমাদের পক্ষে। আমরা এলাকার মানুষ, যারা মূলত আখচাষি তাদের অস্ত্রে সজ্জিত করি। ছোট ছোট গেরিলা দল তৈরি করি। আমার সঙ্গে সেই সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে তখন ছিল চে, কামিলো, রাউল, আবেলসহ আরও অনেক দুর্ধর্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেরিলা যোদ্ধা। এদিকে আমরা হাভানায় আমাদের জুলাই ২৬ দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখি। আমরা সিয়েরা মিয়েস্ত্রা থেকে তাদের নির্দেশনা দেই। তারাও তৈরি করে শহর ভিত্তিক গেরিলা দল। হাভানায় তারা অব্যাহত রাখে আন্দোলন, বিক্ষোভ। এদিকে আমাদের জুলাই ২৬ দলের সঙ্গে যোগ দেয় কিউবার অন্য বাম দলগুলোও। এরপর আমরা নানা সরকারি স্থাপনাতে চোরাগোপ্তা হামলা এবং দখল করার পরিকল্পনা করি। আমরা স্থানীয় গেরিলাদের সহযোগিতায় সিয়েরা মিয়েস্ত্রার বেশ কয়েকটা চিনি কারখানা, স্কুল, হাসাপাতালের নিয়ন্ত্রণ নিই। হাভানাতে আমাদের দলের সদস্যরা নানা চোরাগোপ্তা অপারেশন চালাতে থাকে। আমরা মূলত বাতিস্তা সরকারকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চাই। বাতিস্তা সরকার ইতোমধ্যে লোক দেখানো এক নির্বাচন করে আমেরিকার সমর্থন নিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে বিপুল বিক্রমে আমাদের দমনের কর্মসূচি নেয়। বাতিস্তা পুরো একটা ব্রিগেড পাঠায় সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় আমাদের দমন করবার জন্য। এক পর্যায়ে বিমান হামলা চালায় সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে। কিন্তু আমরা আমাদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করি। আমরা মাত্র শ তিনেক যোদ্ধা বাতিস্তার বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদের কাবু করে রেখেছিলাম তখন। এটা আশ্চর্য ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছিল। এক্ষেত্রে আমি অনেক শিক্ষা নিয়েছিলাম স্পেনের গৃহযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধাদের রণকৌশল থেকে। একটা নিয়মিত বাহিনী সাধারণত আরেকটা নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেই অভ্যস্থ কিন্তু যখন একটা পুরো জনগোষ্ঠী যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং তারা গেরিলা কৌশল গ্রহণ করে তখন নিয়মিত বাহিনী যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদের পক্ষে পেরে ওঠা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

যুবক : আমাদের দেশের ইতিহাসেও কিন্তু ঠিক এমন ব্যাপারই ঘটেছিল। আমাদের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষক নিয়ে তৈরি মুক্তিযোদ্ধার দল পাকিস্তান সেনাবহিনীর মতো পরাক্রমশালী, দক্ষ এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিল।

ক্যাস্ট্রো : একদম তাই। আমি জানি সে ইতিহাস। আমরাও মাত্র তিনশো জন গেরিলা বাতিস্তার আশি হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনীকে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিলাম। দু বছরের বেশি সময় আর যদি একদম সঠিক সময়টা বলি তাহলে ঠিক ২৫ মাস যুদ্ধ চলেছে আমাদের। আর এই পঁচিশ মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত কিন্তু আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম।

না একটু ভুল বললাম। এই পঁচিশ মাসে শুধুমাত্র একদিন আমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে ছিলাম। আমার সেই নির্দিষ্ট তারিখটাও খুব ভালো মনে আছে। সেটা ছিল ১৯৫৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর। আমার সেদিন মা'কে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল, দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল আমাদের সেই বাড়িটা। আমি দুটো জিপে কয়েকজন সঙ্গী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর মেশিন গান নিয়ে চলে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের বাড়ি বিরান্যে। সারাদিন মায়ের সাথে কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে। মা আমাকে বসিয়ে খাইয়েছেন। আমি ঠিক কী করছি মা'র তা স্পষ্ট ধারণা ছিল না কিন্তু মা প্রার্থনা করেছিলেন আমি যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছি তাতে যেন সফল হই।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিল চে। অগণিত ছোট বড় অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছে সে। চে গুয়েভারা শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল না। তার ছিল ক্রনিক হাঁপানি। কিন্তু সেই অসুস্থতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি একটুও। দুর্ধর্ষ সব গেরিলা অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছে সে। ওদিকে হাভানায় আমাদের কমরেডরা অব্যাহত রাখে বিক্ষোভ, আন্দোলন, চোরাগোপ্তা হামলা। একবার প্রেসিডেন্ট ভবনেও হামলা চালায় তারা কিন্তু ব্যর্থ হয় সে হামলা এবং আমাদের কয়েকজন কমরেড সে অপারেশনে নিহত হয়। হাভানায়, সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় আমাদের আক্রমণে নিহত হয় বাতিস্তার বহু সৈন্যও। বাতিস্তা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। অবিরাম হত্যা, গুম, ছাত্র জনতার উপর নির্যাতন চালাতে থাকে সে। গণমাধ্যমের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ, ছাত্র শিক্ষক, নাগরিক সংগঠন সবাই একে একে যোগ দেয় বাতিস্তা বিরোধী আন্দোলনে। একপর্যায়ে আমাদের 'জুলাই ২৬ দল' হরতাল ডাকে। সর্বাত্মভাবে পালিত হয় সে হরতাল। এরমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিক গোপনে সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ে এসে আমার সাক্ষাৎকার নেয়। সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সংগ্রামের কথা, আন্দোলনের কথা, গোপন যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা। জনমত গড়ে ওঠে আমাদের পক্ষে। পাশাপাশি বাতিস্তা তার আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাতে থাকে। কিউবার জনজীবন অচল হয়ে ওঠে। ভেতর ভেতর দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে বাতিস্তা।

যুবক : এক পর্যায়ে তো বাতিস্তা দেশ ত্যাগ করেন ?

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পুরো বাতিস্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। কিউবাতে তার জনসমর্থন শূন্যর কোঠায় নেমে আসে। সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাকে অসহযোগিতা করতে থাকে। সত্যিকার গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। তারপর একদিন সত্যিই আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কোনোভাবেই আর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বাতিস্তা ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর হাভানা ছেড়ে পালিয়ে যায় ম্যাক্সিকোতে। তার অনুসারী এক সেনা অফিসারকে সে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কিউবার ধনিকগোষ্ঠী অবশ্য সেই সেনা অফিসারের পক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু বাতিস্তা হাভানা থেকে পালাবার পর পর আমরা সিয়েরা মিয়েস্ত্রার পাহাড় থেকে বেরিয়ে কিউবার দ্বিতীয় শহর সান্তিয়াগো ডু কিউবা দখল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছি। আমরা সান্তিয়াগো ডু কিউবা থেকেই বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করি। এছাড়াও কিউবার আরও কয়েকটি শহর তখন চলে আসে আমাদের দখলে। কিউবার অন্য সমস্ত বামদল আমাদের নতুন বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন জানায়। শুধু হাভানাই তখন সামরিক সরকারের অধীনে। এরপর হাভানা দখলের জন্য আমি, চে, কামিলো, রাউল এবং আরও অগণিত কমরেডসহ আমরা সান্টিয়াগো ডু কিউবা থেকে হাভানার দিকে রওনা দেই। পথে পথে হাজার হাজার মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। বিজয়োল্লাস করে, আনন্দ করে। হাভানার পথযাত্রায় তারা আমাদের শরিক হয়। হাভানার নড়বড়ে সরকার খুব ভালোমত টের পায় যে তাদের পায়ের নিচে আর মাটি নেই। আমরা হাভানায় পৌঁছাবার আগেই বাতিস্তার অনুসারী যে দলটি ক্ষমতা রক্ষা করবার চেষ্টা করছিল তারাও পালায়। এভাবেই দীর্ঘ সংগ্রামের পর, রক্তপাতের পর সফল হয় আমাদের বিপ্লব। সূচনা হয় কিউবার নতুন ইতিহাসের।

আমি হাভানাতে পৌঁছে প্রথম যে বক্তৃতা দিই সেখানে উপস্থিত ছিল কয়েক লাখ মানুষ। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই, জানাই আজ থেকে লিখিত হবে কিউবার শত বছরের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। সে এক বিশাল জনসমুদ্র, আনন্দ আর উল্লাসের জোয়ার। এ বিজয় ছিল কিউবার মুক্তিকামী মানুষের। সেদিন একটা মজার ঘটনা ঘটে। উল্লাসে অনেক মানুষ সেদিন আকাশে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়েছিল। সব কবুতর আকাশে উড়ে গেলেও একটা কবুতর উড়তে উড়তে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভেতর থেকে হঠাৎ এসে বসেছিল আমার ঘাড়ে। আমি তখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। কবুতরকে আমার ঘাড়ে বসতে দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ করতালি দিয়ে উঠেছিল তখন। ঐ কবুতর যেন হয়ে উঠেছিল আমাদের বিপ্লবের মূর্তিমান প্রতীক। পরে আমি জেনেছি কবুতরকে আমার ঘাড়ে বসতে দেখে কিউবার অনেক ধার্মিক মানুষ ভেবেছিল এ কবুতর বুঝি ঈশ্বরের বার্তা বয়ে এনেছে এবং আমাকে আশীর্বাদ জানাতে এসেছে। সেদিনের সেই বক্তৃতার দৃশ্য তো এখন সারা পৃথিবী থেকেই দেখা যায়। এখন তো ইন্টারনেট জগৎ। তুমি ইউটিউবে গেলেই আমার সেই বক্তৃতা আর কাঁধে বসা সেই কবুতরটাকে দেখতে পাবে।

যুবক : আমি বুঝতে পাচ্ছি কী এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত সেটি। এ তো শুধু কিউবার নয় পুরো পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বাঁক ফেরার মুহূর্ত। কেমন ছিল আপনার অনুভূতি তখন ?

ক্যাস্ট্রো : দেখ আমাদের তো আত্মতৃপ্ত হবার কোনো সুযোগ ছিল না। একটা যুদ্ধে জয় করেছিলাম আমরা কিন্তু আমাদের সামনে তখন আরও কঠিনতম যুদ্ধ। দেশ গড়ার যুদ্ধ। বিপ্লবের সফলতাকে ধরে রাখার যুদ্ধ। সে পথ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও দুর্গম। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ বিপ্লবের পক্ষে থাকলেও অগণিত ক্ষমতাবান, ধনবান, প্রভাবশালী মানুষ ছিল তখন আমাদের বিরুদ্ধে। তখনও অর্থনীতি, দেশের বড় বড় সব শিল্প কারাখানা সব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের হাতে। আমাদের খুব সাবধানে, ধাপে ধাপে এগুতে হয়েছে।

বিপ্লবের পর পরই কিন্তু আমাদের দল সরাসরি ক্ষমতা দখল করেনি। অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা তখন দায়িত্ব দিয়েছিলাম বিচারপতি উরুশিয়াকে। যখন মনকাডা আক্রমণের বিচার চলছিল তখন এই বিচারপতি আমাদের বিপ্লবীদের পক্ষে লড়েছিলেন এবং বেশ কজন কমরেডকে মুক্ত করেছিলেন। আমাদের শক্তিগুলোকে সংহত করবার জন্য আমরা তাকে করেছিলাম অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট। আর আমি রইলাম বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে। তখন বহু মানুষ কিন্তু ভেবেছিল আমেরিকা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আমেরিকা বিরোধী এমন একটা বিপ্লব টিকবে না কিছুতেই। ধ্বসে পড়বে কয়েকদিনের মধ্যেই। আমেরিকার কোনো কোনো পত্রিকা লেখে এসব হচ্ছে কিছু তরুণ ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা। একটা দেশ চালানো, সরকার চালানো ছেলেখেলা নয়। সত্যি বলতে আমরা সবাই তখন ছিলাম নেহাতই তরুণ। আমার, চে'র, রাউলের, আবেলের বয়স সবে ত্রিশের কোঠায়, কারো কারো ত্রিশের নিচে। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমরা কিছু অতি তরুণ বিপ্লবী নিয়েছিলাম দেশ গঠনের কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে তরুণ হলেও বুকে বারুদ থাকলে, সে আগুনেই পথ চলা যায়, চলতে চলতেই অভিজ্ঞতা হয়।

কিন্তু কিউবার শত বছরের বৈষম্যের ইতিহাস পাল্টে ফেলা তো সহজ ছিল না। বিপ্লবের শুরুর পর্বেই দেখা দেয় কিছু জটিলতা। বিচারপতি উরুশিয়া, যাকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আমাদের পক্ষের মানুষ হলেও তার রাজনৈতিক বোধ ছিল দুর্বল আর বিপ্লবী অর্থনীতি নিয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে আমাদের ভেতর মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়। আমাদের নানা বিপ্লবী কর্মসূচির ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে তিনি আমাদের কর্মসূচিগুলো নাকচ করতে থাকেন। এনিয়ে নানা নাটকীয়তার জন্ম হয়। আমরা উরুশিয়ার উপর চাপ তৈরি করিনি, আমি বরং টেলিভিশনে গিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছি। এক পর্যায়ে জনগণের দাবিতেই উরুশিয়া প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বিপ্লবী কর্মসূচিগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্ত বায়নের জন্য এরপর আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিই, চে দায়িত্ব নেয় আমাদের অর্থ দপ্তরের।

যুবক : এরপরই কি আপনারা সমাজতান্ত্রিক ধারার কর্মসূচি প্রণয়ন করতে শুরু করেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাস্ট্রো : আমরা ধীরে ধীরে সেইসব কর্মসূচি শুরু করি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে অবাধ বাণিজ্য, ব্যক্তিগত মুনাফা, লুটপাটের সুযোগ বন্ধ করা। সেজন্য প্রয়োজন দেশের সম্পদের উপর রাষ্ট্রের দখল। আমরা ধাপে ধাপে তা করেছি। আমরা সমস্ত শিল্পকে জাতীয়করণ করেছি। কিউবার সব বড় কোম্পানিগুলোর মালিক ছিল তখন আমেরিকান। বিখ্যাত ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির কারখানা আমরা রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে নিই। এই আমেরিকান কোম্পানি ছিল বাতিস্তার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। আমরা এতকাল আমেরিকায় চিনি রপ্তানি করেছি তাদের কাছে চকলেট কিনবার জন্য। কিন্তু এবার আমরাই আমাদের চকলেট বানাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা শিক্ষার এক ব্যাপক কর্মসূচি নিই। এক বছরের জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বন্ধ করে ছাত্র আর শিক্ষকদের পাঠিয়ে দিই গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এটা ছিল একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ছেলেমেয়েরা বিপুল উৎসাহে সে কাজগুলো করেছে।

কৃষিতে পরিবর্তন আনাটা জরুরি ছিল কিন্তু খুব সহজ ছিল না। কৃষির ব্যাপারে শুরুতেই কোনো চরম নীতি নিইনি। আমরা প্রথমত জমির মালিকানার সিলিং বেঁধে দেই। সর্বোচ্চ ৪০০ হেক্টর জমি রাখবার অধিকার রাখি। তখনকার প্রেক্ষাপটে এটিই ছিল এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। কারণ তখন কোনো কোনো আমেরিকান কোম্পনির ছিল দুই থেকে তিন লক্ষ হেক্টর আখের জমি। তোমাকে আগেই বলেছি আমার বাবারও ছিল অনেক জমি কিন্তু সেসব তখন দিয়ে দিয়েছিলাম রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু এসব কর্মসূচি প্রণয়ন খুব সহজ ছিল না। এসময় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়েছি, কিউবার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছি, শ্রমিকদের সাথে রাতের পর রাতে কথা বলেছি, কথা বলেছি আখ চাষিদের সঙ্গে। আমি কিউবার মানুষদের আমাদের পদক্ষেপগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়েই কিউবার ইতিহাস বদলাবার পথে হেঁটেছি।

বাইরের পৃথিবীতে হাভানার পরিচয় তখন ছিল একটা প্রমোদ শহর হিসেবে। কিন্তু আমরা হাভানার এই পরিচয়কে বদলাবার উদ্যোগ নেই। আমরা হাভানার সব ক্যাসিনো বন্ধ করে দিই, বন্ধ করে দিই সব বেশ্যালয়। তুমি জেনে অবাক হবে কিউবার সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র সৈকতগুলো, পার্কগুলো ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। আমরা সেসব সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিই।

যারা বাতিস্তার পক্ষ হয়ে এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে, গুম করেছে বিপ্লবের পর আমরা তাদের বিচারের ব্যবস্থা করি। একটা ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা তা করি। এ বিচারগুলো আমরা করি প্রকাশ্যে। এই বিচারে তাদের কারো জেল হয়, কারো মৃত্যুদণ্ড হয়। যারা নিজের দেশবাসীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে বেইমানি করেছে সেই মানুষগুলোকে আমরা শুরুতেই উপড়ে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিই কারণ আমরা জানি তা না হলে এরা বরাবর দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য বাধা হয়ে থাকবে।

কিউবার শত বছরের ইতিহাসে ১৯৫৯ সালের আগে পর্যন্ত সে দেশ শাসন করেছে হয় কোনো ভূস্বামী, ধনবান ব্যবসায়ী বা জেনারেল। এই প্রথম লোকে দেখতে পেল সাধারণ মানুষের পক্ষের একটি দল দেশের দায়িত্ব নিয়েছে। তারা অচিরেই বুঝতে পেল এ সরকার তাদের সরকার। যারা সন্দিহান ছিল, যারা ভেবেছিল এসব সাময়িক উত্তজনা তারা অচিরেই টের পেল আমরা কোনো ছেলেখেলা খেলতে আসিনি। সত্যিকার একটা পরিবর্তনের জোয়ার তুলতে এসেছি।

যুবক : কোনো পক্ষ থেকে বাধা আসেনি তখন ?

ক্যাস্ট্রো : বাধা বিপত্তি তো ছিল ব্যাপক। ভয়ানক কঠিন ছিল সেইসব দিন। দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষ ব্যাপকভাবে আমাদের সমর্থন করলেও প্রচুর শত্রুও ছিল আমাদের। যারা বড় ভূস্বামী, কারখানার কোটিপতি মালিক তারা আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। জুয়ার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত সবাই পালিয়ে যায় আমেরিকা। বহু পেশাজীবী ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তারা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে তখন। কিউবা থেকে যারাই আমেরিকায় যেতে চাইল আমেরিকা তাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাল। কিউবান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের মোটা বেতনের চাকরি দিতে লাগল তারা। একটা উদাহরণ দিই। সেসময় আমাদের মোট ডাক্তার ছিল ৬০০০, বিপ্লবের পর পরই ৩০০০ ডাক্তার অর্থৎ একবারে অর্ধেক ডাক্তার চলে যায় আমেরিকায়। আমরা কাউকে বাধা দিইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যারা যাবার তারা যাক। যারা এই ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে থেকে যাবে তারাই খাঁটি দেশপ্রেমিক, আমরা তাদের নিয়েই দেশ গড়ব। অর্ধেক ডাক্তারকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ কিন্তু আমরা পৃথিবীর অন্যতম একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে শুধু নয়, উন্নত বিশ্বের মাপকাঠিতেও কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন আমেরিকা থেকেও লোকে আসে কিউবায় স্বাস্থ্য সেবা নিতে। আমেরিকার এক চলচ্চিত্র পরিচালক মাইকেল মুর তো এ নিয়ে চলচ্চিত্রই তৈরি করেছে। সেটা দেখে নিতে পার।

যুবক : এই ধাপে এসে আপনাদের তাহলে প্রচুর চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে।

ক্যাস্ট্রো : তা তো বটেই। অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিপ্লবের পর আমাদের ব্যাপক আঘাত আসে আমেরিকা থেকে। আমাদের তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করে। আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য চিনির মূল ক্রেতা ছিল আমেরিকা। কিন্তু বিপ্লবের পর আমাদের কাছ থেকে চিনি আমদানি বন্ধ করে দেয় তারা। এ ছিল আমাদের অর্থনীতির উপর বিরাট আঘাত। শুধু চিনি নয় আমাদের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় তারা। এমনকি পৃথিবীর অন্য দেশ যারা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চায় তাদের সঙ্গেও অর্থনৈতিক বিনিময় বন্ধ করে দেয়। কোনো দেশের জাহাজ কিউবার বন্দরে ভিড়লে তার আর আমেরিকার কোনো বন্দরে ভিড়বার অনুমতি ছিল না। আমরা শুরুতেই আলাপ করছিলাম কীভাবে আমি বাংলাদেশের সঙ্গে পাট কেনার চুক্তি করেছিলাম। তাই আমেরিকা তার খাদ্য জাহাজ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। আমেরিকা চেয়েছিল আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে গলা টিপে মারতে। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই আমাদের সাহায্যের জন্য তাকাতে হয় পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শক্তির দিকে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। তারা আমাদের কাছ থেকে চিনি কেনে। এদিকে আমেরিকা টিভিতে, রেডিওতে, সংবাদপত্রে সর্বাত্মকভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করতে থাকে, আমাদের নামে অদ্ভুত সব প্রচারণা চালাতে থাকে। তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে আমরা কিউবার মানুষের কাছ থেকে অচিরেই তাদের শিশুদের কেড়ে নেব। সরলমতি অনেক মানুষ তা বিশ্বাস করে আতঙ্কিত হয়। অনেকে তাদের বাচ্চাদের জাহাজে করে, নৌকা করে পাঠিয়ে দেয় আমেরিকায়। এজন্য আমেরিকা কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ হেলিকাপ্টার, প্লেন পাঠানোরও ব্যবস্থা করে। বুঝতেই পাচ্ছ কতরকম অদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের। আমি বিচলিত হইনি কারণ জানতাম বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়াতেও ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিউবা থেকে পালিয়ে আমেরিকার মায়ামিতে আশ্রয় নেয় অনেক অভিবাসী কিউবান। আমেরিকার সরকার তখন তাদের ভেতর প্রতিবিপ্লবীদের সংগঠিত করে। তারা মিয়মিতে একটা রেডিও স্টেশন খুলে অবিরাম বিপ্লবের বিরোধিতা করতে থাকে, এখনও সেই রেডিও স্টেশন চালু আছে। একপর্যায়ে মায়ামিতে অবস্থিত প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তায় আমাদের বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করবার সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা এবং কিউবা আক্রমণ করে।

যুবক : আমি জানি সেই প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আপনাদের ব্যাপক এক যুদ্ধ হয়েছিল 'বে অব পিগস' নামে।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ঘরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার পর এবার আমাদের যুদ্ধে নামতে হয়েছিল বাইরের শত্রুর সঙ্গে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের পরিকল্পনা ছিল সামরিক আক্রমণ চালিয়ে কিউবাকে পুরোপুরি দখল করে নেবার। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সালে আক্রমণ করে কিউবা। সেই আক্রমণ দলে যেমন ছিল আমেরিকান সৈন্য তেমনি আমেরিকায় অভিবাসী বিপ্লব বিরোধী কিউবানরাও। ১৯৬১-এ এপ্রিল মাসে অতর্কিতে কিউবার উপর বিমান হামলা চালায় আমেরিকা, নৌবহর এগিয়ে আসে আমাদের উপকূলের দিকে। আমাদের বিপ্লব একেবারে চিরতরে ধূলিস্যাৎ করে দেবার জন্য আঁটঘাঁট বেঁধে নামে আমেরিকা।

আমরা আমাদের সবটুকু শক্তি দিয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিই। আমরা কিছুদিন আগেই গেরিলা যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরেছি, তখনও আমাদের জনগণের হাতে অস্ত্র। আমরা জনগণকে উদাত্ত আহবান জানাই এই আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে। দেশকে নানা অঞ্চলে ভাগ করে এক একজন তার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে আমরা আবার নেমে পড়ি যুদ্ধে। চে নেয় পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্ব, রাউল নেয় দক্ষিণের, আমি হাভানাতেই থাকি। আমি সারারাত কমান্ড পোস্টে জেগে থাকি। বে অব পিগসে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ হয়। আমাদের মাত্র ৭ টি বিমান ছিল সেই সময়। সেই বিমানগুলো দিয়ে আমাদের পাইলটরা ঝুঁকি নিয়েই আক্রমণ করে আমেরিকার নৌবহরকে। আমাদের যোদ্ধারা সবটুকু শক্তি ঢেলে নেমে পড়ে স্থলযুদ্ধে। আমাদের শতাধিক যোদ্ধা নিহত হয় সেই যুদ্ধে। একটা ঘটনার কথা বলি। আমাদের এক যোদ্ধা বোমার আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্রলিং করে গিয়ে একটা বাড়ির দরজায় নিজের রক্ত দিয়ে লেখে, 'ফিদেল'। তারপরই সে মারা যায়। আমার নামের ভেতর সে কিউবার মুক্তির মন্ত্র হয়তো দেখেছিল। আমাদের মিউজিয়ামে যদি যাও তাহলে এখনও সেই রক্তে লেখা দরজাটি তুমি দেখতে পাবে। সত্যি কথা কি জান যে জনগণের রক্তের ভেতর বিপ্লবের মন্ত্র এভাবে পৌঁছে যায় তাদের পরাজিত করা এত সহজ নয়। এভাবে আমাদের জনগণই সেদিন ঠেকিয়ে দেয় আমেরিকার সেই আক্রমণ। সেই বে অব পিগসের যুদ্ধে আমেরিকা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একটা ছোট্ট দেশ আমরা কিন্তু আমাদের অন্তর্গত শক্তিতে হারিয়ে দিই পৃথিবীর পরাক্রমশালী একটি শক্তিকে।

এই যুদ্ধ জয় জাতি হিসেব আমাদের আরও সংহত করে, আত্মবিশ্বাসী করে। যুদ্ধের পর আমরা মৃতদের স্মরণে একটা সভা করি। সেই সভায় যোগ দেয় হাজার হাজার মানুষ। আমি সেই সভায় বলেছিলাম, 'মনে রেখ তাদের নাকের ডগার উপর যে আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার দুঃসাহস দেখিয়েছি এ লজ্জার প্রতিশোধ সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা নিতে চাইবে বারবার, তারা আমাদের ক্ষমা করবে না কোনদিন, আঘাত করবে অবিরাম।' আমার সে কথা আজো তো সত্যি, তারা সেই অপমানে এখনও অবিরাম আঘাত করে যাচ্ছে আমাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : এরকম একটা পরিস্থিতিতেই কি আপনারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রতিরক্ষার সাহায্য চাইলেন ?

ক্যাস্ট্রো : বুঝতেই পাচ্ছ আমরা খুব ভালোভাবেই টের পেলাম আমেরিকার দোরগোড়ায় আমরা কতটা নাজুক। আমরা পৃথিবীর আর কার দিকেই বা তখন তাকাতে পারি, শক্তিমান সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া ? এসময় সোভিয়েত ইউনিয়েনের প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভের সঙ্গে আমি সামরিক চুক্তি করি। সেই অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার মাটিতে মিসাইল বসায়। কিন্তু এখবর আমেরিকার কাছে পৌঁছে গেলে সূত্রপাত ঘটে আরেক জটিলতার। প্রেসিডেন্ট কেনেডি তখন বলে কিউবা থেকে সোভিয়েত মিসাইল না সরালে সে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। এমন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা থেকে মিসাইল সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এ নিয়ে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে আমার একটা বাদানুবাদ হয়। কিন্তু আমি সোভিয়েতের অবস্থানটাও বুঝতে পারি। কিন্তু মিসাইল সরিয়ে নেওয়াতে আমরা আবার অরক্ষিত হয়ে পড়ি। আমরা টের পাই একটা উন্মুক্ত ঝুঁকির ভেতর রয়ে গেলাম আমরা। যে কোনো সময় আমেরিকা আবার আমাদের আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের আর পিছু হটবার উপায় নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা আমাদের নিজেদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েই এগিয়ে যাব। আমেরিকা যদি আঘাত করে তাহলে আবার বে অব পিগসের মতো নিজরাই তা মোকাবেলা করব। আমরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখি।

যুবক : এই পর্যায়েই তো আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর চে গুয়েভারা কিউবা থেকে চলে যান ?

ক্যাস্ট্রো : তোমাকে আগেই বলেছিলাম চে হচ্ছে জন্ম বিপ্লবী। কোনো নির্দিষ্ট দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে রাজি ছিল না সে। আর্জেন্টিনার মানুষ হয়েও সে কিউবার বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল আমাদের সরকারে । কিন্তু চে আমাকে আগেই বলেছিল কিউবা একটু দাঁড়ালেই সে চলে যাবে অন্য দেশের বিপ্লবে যোগ দিতে। চে বরাবর বলত শুধু কিউবাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে টিকে থাকা কঠিন হবে আমাদের। এই বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে ল্যাটিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়। আমিও তার সঙ্গে সবসময় একমত ছিলাম। সে একপর্যায়ে কঙ্গোতে বিপ্লবী গেরিলাদের ট্রেনিং দেবার জন্য রওনা দেয়। এর পরই তো বলিভিয়ার ধরা পড়ে সে এবং তারপর চে'কে হত্যা করা হয়। কিন্তু দেখ চে'কে কি সত্যি হত্যা করা গেছে। মৃত্যুর পর আরও প্রবলভাবে সে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের মধ্যে, হয়েছে আরও জনপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চে'র মৃত্য আমাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে। আমি এত ঝড় ঝাপটার ভেতর দিয়ে জীবনে গেছি কিন্তু কোনো শোক আমাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু দুটি মৃত্যুতে আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। একটা চে'র মৃত্যুতে, আরেকটা আমার মা'র মৃত্যুতে। চে'র মৃত্যুতে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছিল। চে যদি বেঁচে থাকত পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারত সে। পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিতে পারত। কিন্তু এও ঠিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চে অনুপ্রাণিত করে গেছে লক্ষ লক্ষ তরুণকে, এখনও করছে। চে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেবার যে অভিপ্রায় নিয়ে কিউবা ছেড়ে গিয়েছিল সেই অনুপ্রেরণাতেই আমি আমার সাধ্য মতো পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষদের সাহায্য করে গেছি। আমি আলজেরিয়ায়, বলিভিয়ার বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করেছি, ঔষধ, ডাক্তার পাঠিয়ে, গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে আমি সাহায্য করেছি ভিয়েতনামের মুক্তকামী মানুষদের। কিউবার প্রত্যক্ষ সহয়তায় এঙ্গোলা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে। আমি ২০ হাজার কিউবান সৈন্য পাঠিয়েছিলাম এঙ্গোলায়, যারা এঙ্গোলার সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে হটিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের আগ্রাসী সৈন্যবাহিনী। এই সেদিন পূর্ব তিমুর যে স্বাধীন হলো সে দেশে আমি পাঠালাম অনেক ডাক্তার। কিউবার ডাক্তাররাই গড়ে তুলেছে পূর্ব তিমুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এভাবেই কিউবা পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সাধ্য মতো সাহায্য করে এসেছে এবং এখনও করছে।

যুবক : ধারণা করি কিউবার জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত এবং দুর্যোগের সময় নিশ্চয়ই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর ! কারণ তখন তো আপনাদের আর কোন সঙ্গী রইল না।

ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, বিপ্লবের পর আমাদের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হয় সোভিয়েত পতনের পর। আমেরিকার মতো একটা ঘোর পুঁজিবাদী দেশের দোরগোড়ায় বসে আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়বার সংগ্রাম করছি সেখানে যখন সমাজতান্ত্রিক দেশের পতন ঘটল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল তখন আমরা সত্যিই একা হয়ে গেলাম। সোভিয়েত কেন ভাঙ্গলো সেটা নিয়ে তো অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র সৃজনশীল না হলে চোরাগলিতে আটকে গিয়েছিল। সেটা অন্য আলাপ। সোভিয়েত পতনে কিউবার কি প্রক্রিয়া হলো সেটা নিয়ে বলি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের যত চুক্তি ছিল সব বাতিল হয়ে গেল। গরবাচেভকে হটিয়ে যখন ইয়েলেৎসিন রাশিয়ার ক্ষমতায় এল সে তো রীতি মতো আমাদের বিরুদ্ধে গেল। ইয়েলেৎসিন এমনকি আমেরিকার মায়ামিতে গিয়ে কিউবার প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ করে আমাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করবার জন্য। আমরা সত্যিই ভীষণ বিপদে ছিলাম তখন। আমার জীবনে, কিউবার জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল সেটি। জীবনপণ করে যুদ্ধ করে যে দেশ আমরা গড়লাম, যে অর্জন আমরা করলাম তা কি সব ভেস্তে যাবে ? ভাবতে হলো আমাদের। সোভিয়েত ছাড়িয়ে একে একে পূর্ব ইয়োরোপের সব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন হতে থাকল। কিন্তু আমরা হাল ছাড়লাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম পৃথিবী যেদিকেই যাক আমরা আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখব।

সত্যি বলতে তখন অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বের একমাত্র শত্রু হচ্ছে কিউবা। তাবৎ সমাজতান্ত্রিক বলয় যখন ভেঙে পড়ছে তখন আমাদের মতো একটা ছোট দেশে সমাজতন্ত্র থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই বলে সবাই ধরে নিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল কিউবায় সমাজতন্ত্রের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমেরিকা তখন কিউবায় তথাকথিত 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবিপ্লবীদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। রেমোনিট, যার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমার আত্মজীবনীমূলক বইটা বের হয়েছে, সে কিউবার বিরুদ্ধে ব্যয় করা আমেরিকার মিলিয়র মিলিয়ন ডলারের একটা হিসাব দিয়েছে। যাহোক, আমরা এ বিশ্বাসে স্থির রইলাম যে সোভিয়েতের পতন মানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পতন নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ায় আমরা কিউবার জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এনেছি সেই অর্জনকে বিসর্জন দেবার কোনো কারণ আমাদের ছিল না। আমরা আমাদের জনগণের শক্তির উপর আস্থা রেখেই এ অবস্থা মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আবার মাঠে মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দিলাম, টেলিভিশনে বক্তৃতা দিলাম, জনগণকে আহবান জানালাম একতাবদ্ধ হয়ে এই অবস্থার মোকাবেলা করার। বললাম আমরা এক কঠিন বিপদের সময় পার করছি, ফলে আমাদের কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হবে।

বরাবরের মতোই এবারও জনগণ তাদের সবটুকু শক্তি দিয়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের দেশের অর্জনগুলোকে রক্ষা করতে। আমাদের জ্বালানি তেল কিনবার পয়সা ছিল না, বললাম, আমরা বাস চালাতে পারব না, গাড়ি চালাতে পারব না, চালাতে হবে সাইকেল। তারা রাজি হলো। আমরা চীন থেকে হাজার হাজার সাইকেল কিনলাম তখন, সেই সাইকেলেই মানুষ যাতায়াত করেছে তখন। আমাদের বিদ্যুৎ ছিল না। আমরা পুরো রাত বিদ্যুৎ দিতে পারিনি। মানুষ অন্ধকারে থেকেছে, অভিযোগ করেনি একটি বারের জন্যও। গ্রামে ট্রাক্টর চালানোর সাধ্য ছিল না আমাদের, বলেছি সাময়িকভাবে আপনাদের আবার ফিরে যেতে হবে লাঙ্গলে। মানুষ আবার তাদের গরুর কাঁধে লাঙ্গল চড়িয়েছে। আমি আমার ইতিহাস পাঠ থেকে জানি ইতিহাস কখনো সোজা পথে হাঁটে না, অংকের নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো হাঁটে না। ফলে ইতিহাসে এমন সব মুহূর্ত আসতেই পারে। কিন্তু আমরা এও বুঝতে পেরেছিলাম যে একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছি আমরা। আমরা বিশ্বব্যাপী একটা বাজার অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করেছি। ফলে আমাদের পরিকল্পনাতেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজতন্ত্রের মূল নীতি থেকে বিচ্যুত না হয়েও আমরা আমাদের অর্থনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে থাকি। আমরা বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করি, কিছু কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার অনুমোদন দিই। সরকারি অনেক জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় দিই চাষাবাদের জন্য। আমাদের অর্থনীতি এতদিন ছিল মূলত চিনি নির্ভর। সেই একমুখী অর্থনীতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করি। আমরা আমাদের পর্যটন শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেই। পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাই আমরা। নতুন নতুন বিশ্বমানের হোটেলে তৈরি করি। সত্যি বলতে আমি নিজে গিয়ে সেইসব হোটেলগুলো নির্মাণ তদারকি করেছি। হোটেলের বিছানাগুলো যথেষ্ট আরাম দায়ক কিনা পরীক্ষা করবার জন্য নিজে সেগুলোতে শুয়ে দেখিছি। আমাদের বায়োটেকনোলোজির একটা ঐতিহ্য ছিল সেটাকে আমরা আরও চাঙা করেছি। এইসব পদক্ষেপে আমরা আমাদের প্রাথমিক বিপর্যয়টা অনেকটাই কাটিয়ে উঠি।

যুবক : এ তো এক অসাধ্য সাধন।

ক্যাস্ট্রো : কেমন করে ইতিহাসের এই মারাত্মক পর্ব আমরা সামাল দিলাম সেটা জানতে হলে তোমাকে এদেশের পথে পথে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষের শক্তিতেই সেটা সম্ভব হয়েছে। কারণ এদেশের প্রতিটা মানুষ মনে করে 'আমিই কিউবা'। তারাই তাদের অর্জনকে রক্ষা করে। এই ক্রান্তিকালীন সময় সুযোগ সন্ধানীরা অনেক সময় ঢুকে পড়েছে কিন্তু এদেশের মানুষ তাদের ঠেকিয়ে দিয়েছে। সোভিয়েত পতনের পর প্রতিবিপ্লবীরা আবার ঢুকে পড়েছিল কিউবায়। তারা ভেবেছিল এবার মওকা পাওয়া গেছে, এই সুযোগে তারা উৎখাত করে দেবে কিউবার বিপ্লবী সরকারকে। তারা হাভানায় মিটিং মিছিলও করেছে। কিন্তু জনগণই হটিয়ে দিয়েছে তাদের। তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। আমাদের অলিম্পিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ানকে আমেরিকার এক কোম্পানি সেসময় এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে বলেছিল, দশ মিলিয়ন কিউবান মানুষের ভালোবাসার কাছে ঐ এক মিলিয়ন ডলারের কী মূল্য ? সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আমেরিকার প্রস্তাব। এইরকম জাতিকে কি সহজে পরাজিত করা সম্ভব ?

যুবক : কিন্তু ফিদেল আমেরিকা তো অবিরাম প্রচার করে আসছে যে আপনি একজন একনায়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাস্ট্রো : আমি সেটা জানি। সারাজীবনই এই কথাগুলো আমেরিকার কাছ থেকে আমি শুনে আসছি। এসব যে তারা বলছে আমি তাতে অবাক হইনি। তবে এ প্রসঙ্গটা এলে আমি ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। একনায়ক কাকে বলে ? যে একা সব সিদ্ধান্ত নেয়, যে ডিক্রি জারি করে শাসন করে সেই একনায়ক। অথচ আমার একা, কোনো বিষয়ে, কোনরকম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কখনো ছিল না, এখনও নেই। বরং একনায়ক যদি কাউকে বলতে হয় তাহলে সে হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের তো এককভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এত অমিত ক্ষমতা যে চাইলেই তিনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারেন। সত্যি বলতে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা আছে তা কোনো রোমান সম্রাটেরও ছিল না। এক রোমান সম্রাট খুব বেশি হলে দুই গ্ল্যাডিয়েটরের ভেতর যুদ্ধ বাধিয়ে একে অপরকে মেরে ফেলবার দৃশ্য উপভোগ করতে পারতেন কিম্বা সিংহের সাথে ক্রীতদাসের লড়াই উপভোগ করতে পারতেন। কিম্বা ধর সম্রাট নিরো খুব বেশি হলে রোম শহরে আগুন লাগিয়ে বসে বাঁশি বাজাতে পারতেন। কিন্তু একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যে কোনো মুহূর্তে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধিয়ে সারা পৃথিবীকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চাইলে সত্যিই ধূলিসাৎ করে দিতে পারে পৃথিবীকে। অবশ্য পৃথিবী যখন ধ্বংস হবে তখন তিনি নিরোর মতো বাঁশি বাজাবার সুযোগ তেমন পাবেন না কারণ তেলাপোকারা তাকে তখন খুব বিরক্ত করবে। শুনেছি তেলাপোকারা নাকি পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকেও নিজেদের বাঁচাতে পারে। তুমি দেখেছ প্রেসিডেন্ট বুশ চাইলেন আর তিনি ইরাককে একটা বদ্ধ ভূমিতে পরিণত করলেন। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে পৃথিবীর কারো কথার কোনো তোয়াক্কা করলেন না তিনি। আরেক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি চান তিনি পৃথিবীকে তেলাপোকার রাজ্যে পরিণত করবেন তাহলে তিনি তাও পারেন। আর আমি কিনা হয়ে গেলাম একনায়ক ? আমি, আমার দল যারা কিনা পুরো জীবনটা উৎসর্গ করলাম অন্যায়, বৈষম্য, ক্ষুধা, অপরাধ, আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, সেই আমি কিনা হয়ে গেলাম একনায়ক ?

যুবক : শুধু আমেরিকা না, ইয়োরোপের শক্তিমান দেশগুলোও সবসময় বলে কিউবাতে কোনো গণতন্ত্র নেই, মানবাধিকার নেই।

ক্যাস্ট্রো : ইয়োরোপ কিসের এত গণতন্ত্রের বড়াই করে বল দেখি ? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বজুড়ে যে দাসত্ব, শোষণ, নিপীড়ন তারা চালিয়েছে, সে ইতিহাসের কোনো নির্মোহ সমালোচনা কি তারা করে ? তারা তো বরং নানা কৌশলে অবিরাম এখনও সেই শোষণ অব্যাহত রাখারই নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে চারদিকে। তাদের যা কিছু অগ্রগতি আজ তার সব পুঁজিই তো যোগান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে তৃতীয় বিশ্ব। যে বৈভব আজ তারা গড়ে তুলেছে তার সবটুকু অর্জিত হয়েছে ওদের উপনিবেশগুলোর সোনা, ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে। সেই ইয়োরোপ কিনা গণতন্ত্রের জন্য মরাকান্না করে ? আমরা যারা তাদের আগেকার দাস মাত্র, যারা তাদের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা থেকে কোনো রকম বেঁচে বর্তে গিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে তুলবার সংগ্রাম করছি সেই আমরা কিনা হয়ে গেলাম অগণতান্ত্রিক ?

তারা মানবাধিকার, মানবাধিকার বলে গলা শুকিয়ে ফেলে। আমি বরং বলি মানবতার অধিকারের কথা। মানবাধিকার নয়, মানবতার অধিকার। এই যে একদল মানুষ বিলাস বহুল গাড়িতে চড়তে পারবে বলে আরেকদল মানুষকে খালি পায়ে থাকতে হয়, এই যে একদল মানুষ নব্বই বছর বাঁচতে পারবে বলে আরেক দল মানুষকে জন্মের পাঁচ বছরের ভেতর মারা যেতে হয়, এসবই তো মানবতার অপমান। সমাজে চরম বৈষম্য টিকিয়ে রেখে গণতন্ত্রের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। ইয়োরোপের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলো মারণাস্ত্র বানাতে যে অর্থ ব্যয় করে তার কানাকড়িও ব্যয় করে না দারিদ্র্য আর অশিক্ষা ঘোচাবার লক্ষ্যে। ধনী দরিদ্রের চরম বৈষম্য ঘোচানো মানবাধিকারের প্রাথমিক শর্ত।

যুবক : আমেরিকা এও বলে থাকে যে, কিউবায় কোনো বাক স্বাধীনতা নেই।

ক্যাস্ট্রো– হ্যাঁ, আমেরিকা খুব বাক স্বাধীনতার কথা বলে কিন্তু লক্ষ করে দেখবে যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আমেরিকার গণমাধ্যমে তুমি কখনো তাদের কণ্ঠস্বর শুনবে না। সেখানে স্বাধীনতা শুধু তাদের জন্য যার পুঁজিবাদের সমর্থক। আমি আমেরিকার সরকারের বিপক্ষে হলেও আমেরিকার সাধারণ মানুষের বিপক্ষে তো নই। আমেরিকায় আছে বহু মুক্তিকামী মানুষ, আছে আমেরিকার বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী ভূমিকার সমালোচনায় মুখর মানুষ কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর তো তুমি সেখানকার গণমাধ্যমে শুনতে পাবে না। সেখানে দুটো দল বেশ ভাগাভাগি করে দেশ শাসন করে চলেছে যুগের পর যুগ। ভালো করে লক্ষ করে দেখবে তাদের ভেতর আদর্শগত তেমন কোনো ফারাক নাই। তাদের সরকার একদলের শাসনের বদলে বরং এক শ্রেণীর শাসন। নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে পারস্পরিক কিছুটা মতভেদ বজায় রেখে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তারা তৈরি করেছে যাতে কোনো কিছুই আর তাদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

তাছাড়া সেখানে কতভাগ লোক ভোট দিতে যায়, ভোটে কত কোটি কোটি টাকার ছড়াছড়ি হয় সেসব তো আমরা ভালোই জানি। তারা তাদের তথাকথিত সেই গণতন্ত্রের মডেল সারা পৃথিবীতে ফেরি করতে চায়। কিন্তু আমাদের ঐ তামাশার গণতন্ত্র চর্চার সময় নেই। আমরা আমাদের দেশকে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে জনগণের ঐক্য। আমাদের সবটুকু শক্তির ঐক্যবদ্ধতা। একারণেই আমরা এতদিন আমেরিকার বিরুদ্ধে টিকে আছি। গণতন্ত্রের নামে এখানে দশটা পার্টি বানালে তো আমেরিকার লাভ। আমাদের বিভক্ত করে বেশ আধিপত্য করা যাবে। এমনকি চীন, ভিয়েতনাম যারা তাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভেতর বাজার অর্থনীতির নানা উপাদান চর্চা করছে তারাও তো বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চা করে না। সুতরাং উন্নয়নের জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্র যে একটা অতি আবশ্যিক শর্ত সেটা তারাও ভুল প্রমাণিত করেছে। আমি মনে করি আমেরিকার চেয়ে কিউবা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা, জনগণের সঙ্গে অবিরাম সংলাপ চালু রাখা। আমরা সেটা আমাদের নিয়মে প্রতিনিয়ত করি। জনগণের পরামর্শ ছাড়া আমরা একটা সিদ্ধান্তও নিই না। সেজন্য আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। আমাদের নিজস্ব ধরনের গণতন্ত্র আছে। আবারও বলি সেটা বুঝবার জন্য কিউবার পথে প্রান্তরে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। দেখ আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় এখনও সেই প্রজন্মই আছে যারা পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ করেছে, যাদের গায়ে লেগে আছে কাদা। জনগণের সাথে প্রতারণা করবার কোনো সুযোগ তাদের নেই। তাই গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের এসব কথা শুনলে আমার খুব ক্ষোভ হয়। সেই ক্ষোভ থেকেই অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম।

যুবক : ফিদেল আপনি যা বলছেন আমি তা বুঝতে পাচ্ছি। আমি এক তৃতীয় বিশ্বের যুবক, তথাকথিত পশ্চিমা গণতন্ত্রের রূপ আমি দেখেছি। এ প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। বলা হয় কিউবায় ধর্মচর্চা করতে দেওয়া হয় না। অবশ্য এ অভিযোগ সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কেই আছে। এ নিয়ে আপনার কী ভাবনা।

ক্যাস্ট্রো : দেখ কিউবা নিয়ে যত অপপ্রচার হয়েছে পৃথিবীর আর কোনো দেশ নিয়ে বোধ হয় অতটা হয়নি। ধর্মের ব্যাপারটা তোমাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। সব মানবজাতির ভেতরই একটা ধর্মীয় চেতনা থাকে। ধর্মকে যদি আধ্যাত্মিক চর্চার একটি বিষয় মনে কর তাহলে সেটা কিউবায় সবসময় ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু এখন যেটা নেই সেটা হচ্ছে ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করা, ফায়দা লোটা। কিউবাতে আমরা কোনো চার্চ বন্ধ করিনি, ধর্ম চর্চার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা দিইনি। সেখানে মানুষ যায় নেহায়েত আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা থেকে। ধর্ম মানুষের মনে গেঁথে আছে হাজার বছর ধরে, তাকে তো ডিক্রি জারি করে বাতিল করা যাবে না। মার্কস একটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। আমি মনে করি না ধর্ম নিজ থেকে আফিম, সেটা নির্ভর করবে কে সেটা ব্যবহার করছে তার উপর। কলম্বাস যখন এদেশে এসেছিল তখন সে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিয়ে এসেছিল বন্দুক আর ক্রুশচিহ্ন। বন্দুক দিয়ে সে এই ভূমিকে জয় করেছিল আর ক্রুশ দিয়ে সে সেই জয়কে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিল। ধর্মকে যুগে যুগে আফিম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিউবাতেও চার্চ সবসময় ছিল ধনীদের দখলে। আমরা সেই বলয়টাকে ভেঙে দিয়েছি। আমি জানি ধর্ম বহু মানুষের আত্মার মতো। আমরা সেটাকে আঘাত করিনি।

তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমার মা ভীষণ ধার্মিক ছিলেন, আমাদের সারা বাড়িতে সাধু সন্তদের মূর্তি থাকত। আমি যখন গেরিলা যুদ্ধ করছি আমার মা তখন আমার নামে নানা রকম মানত করতেন। আমি দেখেছি সেটা তাকে কতটা স্বস্তি আর আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে। আমি সেই বিশ্বাসে আঘাত দেইনি। আমি যখন সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় যুদ্ধ করছি তখন গ্রামের এক মেয়ে আমাকে একটা যিশুর মূর্তির লকেট দিয়ে খুব করে অনুরোধ করেছিল আমি যেন সেটা গলায় পড়ি তাহলে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবে। আমার তাতে বিশ্বাস ছিল না তবু আমি সেই মেয়েটির ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানাতে সেই ক্রুশ গলায় পরেছি। আমি আমার বক্তৃতায় প্রায়ই যিশুর উক্তি ব্যবহার করতাম। বলতাম যিশু সবসময় গরিবদের পক্ষে ছিলেন। যিশুর সেই কথাটা আমি প্রায়ই বলতাম, ' সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে একটা উটও হয়তো চলে যেতে পারবে কিন্তু ধনীলোক কখনো স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না'। আমি আরও বলতাম যিশু গরিবদের খাওয়ানোর জন্য তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে রুটি দ্বিগুণ করে দিতেন। আমরা বিপ্লবের মাধ্যমে আসলে সে কাজটাই করতে চাচ্ছি। যিশু মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন কিন্তু একজন কোটিপতি আর একজন ভিক্ষুকের মধ্যে তো কোনো ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না। ধর্ম মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত একটা বিষয়। আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে না গিয়ে ধর্মের ভেতর আমাদের বিপ্লবের সমর্থন খুঁজেছি। আমদের মূল লক্ষ্য সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, কেউ যদি ধর্মবোধ থেকে সেই লক্ষ্যে যোগ দেয় তাতে আমরা আপত্তি করিনি। তোমাকে তো বলেছি বিপ্লবের পর আমি প্রথম বক্তৃতা দেবার সময় আমার কাঁধে একটা কবুতর এসে বসেছিল আর অনেকে এর ভেতর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার লক্ষ করেছে। তাতে তো অসুবিধা নেই। আমি তো কিউবাতে পোপকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। সুতরাং কিউবাতে ধর্ম চর্চার বাধা আছে এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু কিউবায় রাষ্ট্রশাসনে চার্চের কোনো ভূমিকা নেই। একসময় চার্চের আর্চ বিশপ ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মতোই ক্ষমতাবান। কিন্তু এখন আর্চ বিশপের কোনো ক্ষমতা নেই। ধর্ম নেহায়েতই ব্যক্তিগত চর্চার ব্যাপার। নিজের আধ্যাত্মিক তাগাদা থেকে মানুষ চার্চে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবক : ফিদেল আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক অনেক দেশই আজ নানা জটিল সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলোর সমন্বয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে তাদের জন্য। এই দেশগুলোর কাছে আপনার কি কোনো উপদেশ আছে ?

ক্যাস্ট্রো : দেখ আমি উপদেশ দেওয়ার মানুষ নই। আমার উপদেশ তোমার দেশে কাজে লাগবে সেটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। আমি আগেই বলেছি যার যার মুক্তির পথ তাকে খুঁজে দিতে হবে। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। এইটুকু বলতে পারি প্রান্তিক দেশ, ক্ষুদ্র দেশ, দরিদ্র দেশ বলে কিছু নেই। মনে রেখ আমাদের থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরের আমেরিকা, যে দেশ বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের অর্ধেক ব্যয় করে থাকে, বাকি পৃথিবীতে যত পারমাণবিক বোমা আছে তার চাইতে বেশি আছে যে দেশের হাতে, যাদের সামরিক, আধাসামরিক শক্তি, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সমর্থক দেশগুলোর সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা কিউবার লোক সংখ্যার চাইতে বেশি, যে দেশের জিডিপি কিউবার জিডিপির কয়েকশো বছরের বেশি সেই দেশ অব্যাহতভাবে আক্রমণ করে চলেছে কিউবাকে, হুমকি দিচ্ছে। শুধু কিউবাকে ঠেকানোর জন্য তাদের আছে মিলিয়ন ডলারের বাজেট, প্রতিসপ্তাহে সেখানে ৫০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় রেডিও এবং টিভিতে শুধুমাত্র আমার এবং কিউবার বিরুদ্ধে প্রচারে। সেই আমেরিকাকে আমরা ঠেকিয়ে রেখেছি গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। অথচ একসময় আমাদের বলা হতো ভীরু, দুর্বল, পশ্চাৎপদ একটি জাতি।

AMARBOI.COM

তেমনিভাবে পুরো সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন যখন ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল, যখন সবাই দিন গুনছিল এই বুঝি কিউবা ধসে পড়ে তখনও আমরা স্রোতের বিপরীতে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। ঘোষণা করা হয়েছিল সমাজতন্ত্রের কবর হয়ে গেছে, চির বিজয় ঘটেছে পুঁজিবাদের। কিন্তু আমরা টলিনি। আমরা জানি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ একটা চরম সংকটের ভেতর পড়েছে। মানুষের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি সে। কিন্তু তাই বলে মানুষে মানুষে বৈষম্যহীন, সাম্যবাদী একটা সমাজের স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যায়নি। আমরা বুঝেছি যে সমাজতন্ত্রের ধারনাকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিতে নতুন ব্যাখ্যায়।– আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করে গেছি। পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার যে জয়গান গাওয়া হয়েছিল তাও তো ইতোমধ্যে মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে। যে সব দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বাতিল করে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছে তারাও তো তাদের মানুষকে মুক্তি দিতে পারিনি। সেসব দেশে বেড়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বৈষম্য। ইয়োরোপ এখন মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার ভেতর দিয়ে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কিউবাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি তা কিছুতেই দাবি করতে পারি না। আমরা এখনও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছি, আমাদের সব মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি সভ্যতার সব অর্জন। কিন্তু আমরা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মিটিয়েছি। কিউবার রাস্তায় তুমি হয়তো সাম্প্রতিক মডেলের চৌকস গাড়ি দেখতে পাবে না, অত্যাধুনিক শপিং মল পাবে না কিন্তু সেইসঙ্গে একজন অশিক্ষিত মানুষও পাবে না, একজন বেকারও পাবে না। একজন মানুষ পাবে না যে চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কিউবায় তুমি কোনো ভিক্ষুক দেখতে পাবে না, ফুটপাতে ঘুমানো কোনো মানুষ দেখতে পাবে না। আমরা কিউবার মানুষের গড় আয়ু বাড়িয়ে করেছি ৭৫ বছর যা অনেক উন্নত দেশের চেয়েও বেশি। কিউবার শিশু মৃত্যুর হাড় বহু উন্নত দেশের চাইতেও কম। কিউবার মতো একটা ছোট্ট দেশ খেলাধুলায় অলিম্পিক থেকে ছিনিয়ে আনছে পদক। কিউবার মেয়েদের ব্যালে নাচ মুগ্ধ করছে সারা বিশ্বের মানুষকে। এসবই সম্ভব হচ্ছে কিউবার আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের জন্য যারা নিজের উপর আস্থা রেখে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আমরা কোনো ভয়, চাপ, নির্দেশ দিয়ে দেশ চালাইনি, অবিরাম মানুষের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশে পরিচালনা করেছি। আমরা যে পথে হেঁটেছি সেটা তোমাদেরও পথ হবে তেমন দাবি কখনোই করব না। আবারও বলছি তোমাদের নিজেদের পথ নিজেদের খুঁজে নিতে হবে। আমরা তোমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারি মাত্র। এটুকু বলতে পারি আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে নিজেদের শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে। তোমাদের দুর্বল, দরিদ্র বলে অবিরাম প্রচার করা হবে যাতে তোমরা তথাকথিত শক্তিমানদের তাঁবেদারি কর। আমরা করিনি এবং আমরা টিকে আছি। সত্যি বলতে ইতিহাসে এখন আমরা আগের যে কোনো সময়ের চাইতেও স্বাধীন কারণ আমরা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক কোনো বলয়ের ভেতরই আর নেই।

যুবক : ফিদেল, এবার একটা ভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করি। একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে। এই যে আপনি একজন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন, ইতিহাসে আপনার অমরত্ব অবধারিত হয়ে গেছে। এসব ভাবতে কেমন লাগে আপনার ?

ক্যাস্ট্রো : দেখ ইতিহাস, অমরত্ব এগুলো খুব গোলমেলে ব্যাপার। তুমি জানতে চাচ্ছ একজন যখন টের পায় ইতিহাসে তার একটা স্থান দাঁড়িয়ে গেছে তখন তার কেমন অনুভূতি হয়। কিন্তু সত্যি বলতে অন্যরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে এই ভাবনায় নিজেকে ক্লান্ত করে তুলবার কোনো কারণ আমি দেখিনি। আমি যখন মনকাডা আক্রমণ করেছি, যখন সিয়েরা মিয়েস্ত্রার পাহাড়ে লড়াই করেছি তখন এক মুহূর্তের জন্যও নিজের খ্যাতির কথা নিয়ে ভাবিনি। অন্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মত্যাগের বিনিময়ে নিজের ভাবমূর্তি বাড়ানো আমার কাছে অন্যায় মনে হয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন যারা ইতিহাসে তাদের স্থান কী হবে এসব ভাবনায় আচ্ছন্ন থেকেছেন। অনেকে কাজ করেছেন শুধুই খ্যাতি অর্জনের জন্য, ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেবার জন্য। কতজন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার জন্য মনুমেন্ট করেছেন। মিশরের পিরামিডগুলোর কথা ভাব। ফারাওরা সব পিরামিড বানিয়েছিল পৃথিবীতে নিজের একটা চিহ্ন রাখার জন্য। কিন্তু ভেবে দেখ তো কী হয়েছে আজ সেইসব পিরামিডের আর সেইসব ফারাওদের ? সেইসব ফারাওদের মমিগুলো সব টেনে হেঁচড়ে এখন সাজিয়ে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। তাও মিশরের মিউজিয়ামে নয়, লন্ডন প্যারিসের মিউজিয়ামে। সার্কাস দেখার মতো লোকে পয়সা দিয়ে সেইসব মমি দেখতে যায়। আর ক্রীতদাসদের শ্রমে ঘামে তৈরি সেই পিরামিডগুলো মরুভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এক করুণ নির্মম ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। সুতরাং ইতিহাসে নিজেকে কীর্তিমান করে তুলবার কোনো অর্থ নেই। ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষের ভূমিকা ক্ষণস্থায়ী। আমি মনে করি ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে আমার সামান্য একটা ভূমিকা ছিল যেটা আমি পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। ল্যাটিন আমেরিকার প্রখ্যাত নেতা সাইমন বলিভার একবার বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সব কীর্তি একটা শস্য দানার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলা যাবে।' সুতরাং কীর্তি নিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই।

ঐ যে জানালার বাইরে রাতের আকাশে দিকে তাকাও, দেখতে পাচ্ছ নক্ষত্রগুলো জ্বলছে মিটিমিটি করে ? জান তো নক্ষত্ররাও মানুষের মতো বাঁচে আবার মারা যায়। ঐ যে নক্ষত্রটা ওটাও একদিন নিভে যাবে, সূর্যও একদিন আর আলো দেবে না, পৃথিবী নামের এই গ্রহটা অদৃশ্য হয়ে যাবে একদিন। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস। তখন কে থাকবে ফিদেলের খ্যাতি দেখবার জন্য ? সুতরাং সত্যি বলতে আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও চিন্তিত নই, আমি বরং মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

যুবক : ফিদেল, আপনি কি মানুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী ?

ক্যাস্ট্রো : আশাবাদী আমাদের হতেই হবে। যতদিন পৃথিবী সেই ছায়াপথে হারিয়ে না যাচ্ছে আমাদের স্বপ্ন দেখে যেতেই হবে। মনে রেখ মানুষ মরে গেলেও, মানবতার মৃত্যু নেই। মানুষ মঙ্গলগ্রহে যেতে পারবে কিন্তু এই পৃথিবীতেই একটা স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল, বৈষম্যহীন সমাজ তৈরি করতে পারবে না তা তো হয় না। এ পৃথিবী একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, মানবতার উপর বিশ্বাস রেখে সব মুক্তিকামী মানুষ মিলে নতুন সময়কে, নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, নতুন নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে। অন্যকে দায়ী করে লাভ নেই, অন্যের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরসা করে লাভ নেই, অন্যের চাটুকারিতা করেও লাভ নেই। আস্থা রাখতে হবে নিজের উপর, আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। সমস্ত ব্যর্থতার, বেদনার ভেতর থেকে জেগে উঠতে হবে আমাদের। আমার প্রিয় কবি পাবলো নেরুদার কবিতার ভাষায় বলি–

দোষ অন্যের কাঁধে চাপিও না কখনো, অন্যের নামে কোরো না নালিশ
কারণ মূলত সে জীবনই তুমি পেয়েছ যা তুমি চেয়েছিলে
নিজেকে গড়ে তুলবার যে সংকট, মেনে নাও তাকে
সঞ্চয় করো নিজের ভুল শুধরে নেবার সাহস।
ভুলের ভস্ম থেকেই উত্থিত হয় সত্যিকার মানবিক অর্জন।
নিজের ভাগ্য আর একাকিত্বকে দায়ী কোরো না কখনো।
তাকে গ্রহণ করো এবং মোকাবেলা করো সাহসের সঙ্গে।
মনে রেখ কোনো না কোনোভাবে তা তোমারই কাজের পরিণতি এবং
এর ভেতরই নিহিত আছে জয়ের লক্ষণ।
নিজের ব্যর্থতায় হয়ো না হতাশ, সে হতাশা তুলে দিয়ো না অন্যের জীবনে।
নিজেকে গ্রহণ করো এখনই নইলে বরাবর শিশুর মতো নিজেকে ভাববে সঠিক।
মনে রেখ শুরু করবার জন্য যে কোনো সময়ই সঠিক সময়
কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার জন্য কোনো সময়ই সঠিক নয়।
ভুলে যেয়ো না তোমার অতীতই নির্মাণ করেছে তোমার বর্তমান
তেমনি তোমার বর্তমান নির্মাণ করবে তোমার ভবিষ্যৎ
সাহসী, শক্তিমানের কাছ থেকে শিক্ষা নাও
শিক্ষা নাও তার কাছ থেকে যে পরিস্থিতিকে বিনা মোকাবেলায় মেনে নেয় না
যে কোনো মূল্যে যে নিজেকে টিকিয়ে রাখে।
সমস্যা নিয়ে কম ভাবো, ভাবো তোমার কাজ নিয়ে।
বেদনার গহ্বর থেকে উঠে আসতে শেখো,
শেখো কঠিনতম প্রতিবন্ধকতার থেকেও শক্তিমান হয়ে উঠতে।
নিজের আয়নায় নিজেকে দেখ, তাতেই মুক্ত আর শক্তিমান হয়ে উঠবে তুমি।
দেখবে তখন আর অন্যের হাতে পুতুল হয়ে রইবে না তুমি।
জেনে রেখ তুমিই তোমার অদৃষ্টের নিয়ন্তা
ওঠো, ভোরের সূর্যের দিকে তাকাও, বুক ভরে নাও সূর্যালোক
তুমিই এখন তোমার জীবনের শক্তির অংশ।
ওঠো, এগিয়ে যাও, লড়াই করো,
তাকিয়ে দেখ পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বিজয়।
ভাগ্য নিয়ে ভেব না কখনো কারণ ভাগ্য ব্যর্থতারই অজুহাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেরুদার কথা স্মরণ করেই আমাদের আলাপ আজ শেষ করি, কি বলো ?

যুবক : ঠিক আছে ফিদেল। আপনাকে ধন্যবাদ জানবার ভাষা আমার নেই। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ক্যাস্ট্রো : তোমার প্রতি শুভকামনা, শুভ কামনা তোমার দেশটির প্রতিও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা তোমাদের সংকট কাটিয়ে উঠবে। তোমরা তো লড়াকু জাতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~